তীর্থদর্শন

মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

সত্যব্রত মঠ

জামতাড়া
(সাঁওতাল পরগণা)

বেহুলা, গুপ্তিপাড়া
(হুগলী)

পোঃ গুপ্তিপাড়া
বেহুলা,
জিঃ হুগলী।

মূল্য—আড়াই টাকা

প্রথম সংস্করণ—১৩৬০

বাঁধাই—
প্রিন্টোফিক্স
২৪/এ, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
উৎপল প্রেস
১১০/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার কৃপালোকে এ জীবন আলোকিত হইয়াছে,
যাঁহার প্রসাদলাভে এ তৃষিত প্রাণ শীতল হইয়া ধন্য হইয়াছে,
'দক্ষিণাস্বরূপ' তাঁহাকে দিবার মত কি-ইবা আছে!
এক্ষণে যাহা কিছু দেখিতেছি—সকলই তাঁহার;
আমার বলিতে কিছু নাই যে, তাঁহাকে অর্পণ করিব!!
তবে তাঁহারই আশীর্ব্বাদে পথে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি,
তাহারই মালা গাঁথিয়া, সেই পরম দেবতা—
শ্রীগুরুর চরণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

মুখপত্র

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম
পাপো নৃষদ্বরোজন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা চরৈবেতি।
পুষ্পিন্যৌ চরতো জংঘে ভূষ্‌নুরাত্মা ফলগ্রাহিঃ
শেরেহস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথেহতশ্চরৈবেতি।
আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ
শেতে নিপদ্যমানস্য চরতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি।
কলি শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠং ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি।
চরন্বৈ মধু বিন্দতি চরন্‌ স্বাদুমুদুম্বরম্‌
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যে ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।"

—"*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় খণ্ড,*
৩৩শ অধ্যায়" হইতে উদ্ধৃত।

ভ্রমণ-শ্রান্ত হবে শ্রীমন্ত, ইন্দ্রসখ্য লভিবে সে তায় সন্দ নাই ;
না ভ্রমিলে হায় বরণীয় জনও ভাগ্য হারায় ;
বিচরণ কর—করগো তাই।
পুষ্পিত হয় জংঘা-যুগল. ফলন্ত হয় পান্থ যে তা'র সকল ঠাঁই ;
ভ্রমিয়া সতত, শায়িত—নিহত হয় পাপ যত,
বিচরণ কর—করগো তাই।

বসে যে ভাগ্য ব'সে থাকে তা'র, দাঁড়ালে দাঁড়ায়,
ঘুমালে ঘুমায় জানাতে চাই ;
চলিলে ভাগ্য সচল থাকিবে ; বিচরণ কর—
বিচরণ কর—করগো তাই ।
'কলি' যে শয়ান, 'দ্বাপর' আসীন, দণ্ডায়মান 'ত্রেতা'
যুগে—যুগে বুঝিতে পাই,
'কৃত' বিচরণ করে চিরদিন ; বিচরণ কর—
বিচরণ কর—করগো তাই ।
বিচরণকারী মধু লভে, আর উডুম্বরের স্বাদু ফল-ভার তুলনা নাই ;
তন্দ্রা-লুপ্ত সূর্য্য-দীপ্ত চিত্ত তাহার ; বিচরণ কর—করগো তাই ।

—শ্রীসুধীর গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুদিত ॥

[দশ পংক্তি সংস্কৃতের অনুবাদ দশ পংক্তিতে বাংলায় করা হইয়াছে। শুনঃশেফের উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতকে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র উপরিলিখিত উপদেশ প্রদান করেন। সমস্ত বৈদিক্ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শ্লোকসমূহের মধ্যে এই দশ পংক্তিও উল্লেখযোগ্য। তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী কী সুন্দর ও সার্থক। বৈদিক্ জীবন-দর্শন প্রজ্ঞামূলক ; মূল প্রতিপাদ্য সত্য, মনুষ্যত্ব ও মৈত্রীবর্দ্ধক ; সুতরাং উহার মধ্যে সর্ব্বযুগের মানব-মনের কল্যাণ-বর্দ্ধক নীতি বর্ত্তমান।—অনুবাদক]

ভূমিকা

শৈশব কাল হইতেই ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করিব এরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কখন কিভাবে তাহা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। যতদিন না মানুষ পরম সত্যের সন্ধান পায় ততদিন তীর্থ ও পাষাণ দেবতার মাঝেই তাহার অভীষ্টের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। এ অবস্থায় ইহার অধিক আর কিছু প্রাপ্য আছে বলিয়া ধারণায় আসে না। এই অটুট বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতার ফলেই পাষাণ ভেদ করিয়া দেবতার আবির্ভাব ও আত্মচৈতন্যের উন্মেষ হয়। কিন্তু এই অবস্থায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য সন্ধানের জন্য তীর্থাদি আবশ্যক হয়। দুর্ব্বলের পক্ষে যষ্টি অবলম্বনীয়, সেরূপ তীর্থদর্শনাদিও একটি অবলম্বন। এই অবলম্বন হইতেই পরিণামে একদিন পরমাশ্রয় লাভ হয়। এই আশ্রয় পাইলে আর অন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন থাকে না। তীর্থ পর্য্যটনের ফল কায়াশুদ্ধি, উপাসনার ফল চিত্তশুদ্ধি। কায়া শুদ্ধ হইলে উপাসনার অধিকার জন্মে। ইহা দ্বারা মনের স্থিরতা লাভ হয়। মনের স্থিরতা দ্বারাই অভীষ্ট অনুরূপ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া যায়।

'তীর্থ' শব্দের অর্থ স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা জ্ঞানমূলক। যিনি এ বিষয় সত্য সত্যই জিজ্ঞাসু, প্রকৃতি তাহারই নিকট প্রকৃত তীর্থের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। জ্ঞানলাভই যদি তীর্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন তীর্থই ছোট বা বড় নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে প্রথম ভাগ যেমন প্রয়োজন, বোধোদয় ও তেমনি। প্রথম ভাগের পরিচিত অক্ষরগুলিই উচ্চ শিক্ষার চির সহচর। প্রথম ভাগের জ্ঞান যেমন উত্তরোত্তর উচ্চ জ্ঞানলাভের

সাহায্য করে, তেমনি নিম্নস্তরের তীর্থদর্শনের যাবতীয় অভিজ্ঞতাও জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ স্তরে চরম তীর্থে উপনীত হইতে সাহায্য করে। জ্ঞান কখনও নষ্ট হয় না। নিম্নতর জ্ঞানই অবশেষে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে পরিণত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থাবরতীর্থের দেবতা জড় বিজ্ঞান। জঙ্গম তীর্থের দেবতা আত্মবিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। জড় বিজ্ঞানে গতিশীল সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক অভিজ্ঞতা, মনোবিজ্ঞানে চিত্তের গতিবিধি ও বুদ্ধির বিচারশীলতা এবং আত্মবিজ্ঞানে জীব ও জগতের একত্বানুভূতি—ইহাই তীর্থ ও দেবতার মাহাত্ম্য। এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণের বিবরণী প্রকাশ করা হইল।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ও বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনই বিশ্বের শাশ্বত নিয়ম পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া অতীতের অনুশীলন করিলে বর্ত্তমানের সহিত উহার যোগসূত্র নির্ণয় করা এবং বর্ত্তমানের সহিত উহার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব। পাঠক পাঠিকাগণ এই তীর্থদর্শন বৃত্তান্ত পাঠে যদি ভারতীয় ঐতিহ্যের মহনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে সেই শাশ্বত অপরিবর্ত্তনশীল মহাদেবতার বিভূতির পরিচয় অবধারণ করিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সক্ষম হন, তবেই গ্রন্থ রচনা সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের পরিশোধনে, রূপায়ণে, এবং প্রকাশনে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংবাদিক শ্রীরাধিকারঞ্জন নন্দী এবং কবি শ্রীসুধীর গুপ্তের নিকট হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সর্ব্বাধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

সত্যব্রত মঠের প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

"সত্যব্রত মঠ"

পোঃ জামাতাড়া, (সাঁওতাল পরগণা)

"সত্যব্রত মঠ"

পোঃ গুপ্তিপাড়া, বেহুলা, জিলা হুগলী

শ্রীমতী রেণুকা সেনগুপ্তা

১, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৫

শ্রীরাধিকারঞ্জন নন্দী

প্রেস সার্ভিস্ ব্যুরো

২০, মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ বক্স ৬৭৬৯

কলিকাতা-৭

এবং

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

"গুরুস্মৃতি" ও "কৃপাবিন্দু"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সত্যব্রত মঠের প্রতিষ্ঠাত্রী-আচার্য্যা
মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী

তীর্থদর্শন।

১৩২৮ সালের মাঘ মাসে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হই। তীর্থপর্য্যটক আমরা সংখ্যায় সাতজন ছিলাম। তাহার মধ্যে ছয়জন স্ত্রীলোক, অপরজন আমার গুরুভাই শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী রামেশ্বরানন্দ গিরি)। তাঁহাকে আমরা সাধারণতঃ "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তাঁহার যেমন ছিল সৎসাহস ও চরিত্রবল, তেমনই ছিল অসাধারণ আত্মত্যাগ। এই তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্যোক্তা যদি চ আমার গুরুভগ্নি মাতা জ্যোতিঃচৈতন্য ব্রহ্মচারিণী, তথাপি মহারাজের আর্থিক ও কায়িক সর্ব্ববিধ সাহায্য ব্যতীত তীর্থপর্য্যটন সফল হইত কিনা সন্দেহ। ছয়জন স্ত্রীলোকের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধা শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী, বালিকা উষাঙ্গিনী দেবী, আর অপর দুইজন মমতাদেবী ও সুরেন্দ্রবালা দেবী। সুরেন্দ্রবালা অত্যন্ত সৎসাহসী ও উদ্যমশীল ছিল। আমরা চারিজন প্রায় সমবয়সী ও একভাবের ছিলাম। প্রায় সকল কার্য্য একসঙ্গে একমত হইয়া করা হইত। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে মহারাজের সঙ্গে আমাদের কথা

রহিল যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি বটে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতায় কোন বাধা দিবেন না; দ্বিতীয়তঃ কোন তীর্থে যাইয়া আমরা পাণ্ডার সাহায্য লইব না। মহারাজ সরকারী চাকুরী করিতেন। ছয়মাসের ছুটি লইয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়দের সহিত আমাদিগকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রনাথ তীর্থে যাত্রা করেন।

চন্দ্রনাথ তীর্থ

চন্দ্রনাথ তীর্থ ঃ—সৃষ্টির আদিতে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু সেই দেহ চক্রের দ্বারা ছেদন করেন। উহা যে সকল স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সকল স্থানই পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ পর্ব্বত-শিখরে দেবীর দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ পতিত হয়। এখানে দেবী 'ভবানী', ভৈরব 'চন্দ্রশেখর' অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তিতে স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিম পার্শ্বস্থ মন্দিরে ভৈরব ও ব্যাসমুনি বিরাজিত। তাহার নিকটে ব্যাসকুণ্ড। সীতাকুণ্ডটী ভরাট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মন্দিরটি এখনও উন্নত মস্তকে অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার অদূরে বনবিটপীলতা পরিবেষ্টিত প্রকৃতির রমণীয় স্থানে রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ড অবস্থিত। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে মহাদেবের নেত্রাগ্নি অনবরত পাষাণ গাত্রে প্রজ্জ্বলিত। এই জ্যোতির্ম্ময়ের দক্ষিণে

মন্দির মধ্যে দশভূজা মূর্ত্তি বিরাজিতা। তাহার পর শম্ভুনাথের মন্দির অনুচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। পার্শ্বদেশে রাম, লক্ষ্মণ সীতা অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দিরটি মনোরম উদ্যানে অবস্থিত। নিকটেই মন্মথ নদ বা পাদগয়া। এস্থানে যাত্রীরা পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ইহার পরে ঊনকোটী শিবমন্দির অবস্থিত। এই শিবলিঙ্গ ঝর্ণার জলে স্বয়ং স্নাত হন। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়। পর্ব্বতের শিখরদেশে চন্দ্রনাথ তীর্থ অবস্থিত। মন্দির অভ্যন্তরে বৃহৎ হরগৌরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাতালপুরী গুপ্তকালী প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্রশেখরের ন্যায় চড়াই পর্ব্বত অতি বিরল।

সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে 'বারবানল' অবস্থিত। এখানে জলের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা চলমান। যাত্রীরা এস্থানে স্নান, তর্পণ ও ঐ শিখায় আহুতি প্রদান করে। লবণাক্ষ নামে একটি তীর্থ সীতাকুণ্ড হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সহস্রধারা, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি এস্থানে বিরাজমান। এখান হইতে সমুদ্র দ্বীপ মধ্যে আদিনাথ মন্দির অবস্থিত। সময়াভাবে সেখানে আমাদের যাওয়া হয় নাই। চন্দ্রশেখর হইতে সে মন্দিরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার দর্শনাদি শেষ করিয়া যথাস্থানে ফিরিবার পথে একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকেন। ইহাতে মহারাজ ও অন্যান্য সঙ্গীরা বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতে

লাগিলেন কিন্তু আমার ইহাতে হাসি পাইল। তখন সাধুটি শেষবার গালি দিলেন, "অতি বৃদ্ধা মাগি তুই কপালে আগুণ, কোন গুণ নাই তোর সিদ্ধিতে নিপুণ।" প্রথম তীর্থপর্য্যটনে সাধুর এই গালি আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলাম।

চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনের পর ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করিবার বাসনা প্রবলতর হইয়া উঠিল। ভারতের চারিদিকে চারিধাম অবস্থিত। পূর্ব্ব সীমান্তে শ্রীক্ষেত্র বা পুরী, দক্ষিণে রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্বারকা ও উত্তরে হিমালয় সীমান্তে বদরিকাশ্রম। এই চারিধাম পর্য্যটন করিলে প্রায় সকল তীর্থস্থানই পরিক্রমন হয়। তীর্থপর্য্যটন করাই কেবল উদ্দেশ্য ছিল না, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তীর্থ মাহাত্ম্য জানা এবং অবশেষে সংসার ত্যাগ। যাহা হউক, এই উদ্দেশ্যে প্রথমে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কালীঘাট

কালীঘাট ঃ—৺কালীমাতার দর্শন মানসে কালীঘাট গমন করিলাম। জনস্রোত ও বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া আঙ্গিনায় পৌঁছিলাম। আঙ্গিনার পার্শ্বস্থ দোকানগুলিতে পূজার পুষ্প, পত্র, ফল ও মিষ্টান্নাদি সম্ভারপূর্ণ। কোনপ্রকারে শ্রীমন্দিরের বারান্দায় প্রবেশ করিলাম, কিন্তু মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হইল না। কারণ তখনকার দিনে প্রায় সকল তীর্থস্থানেই পাণ্ডারা যাত্রীদের নিকট প্রবেশের জন্য পয়সা আদায় করিত এবং সন্তোষজনক আদায় না হইলে যাত্রীদের

পীড়ন করিত। চোখের সামনে একজন যাত্রীর উপর এরূপ পীড়ন দেখিয়া মনে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। সে সময়ে গম্ভীরায় (মূল মন্দির) প্রবেশের জন্য ১৬৲ টাকা দিতে হইত। আমরা স্থির করিলাম, বিনা দর্শনীতে যে কোন উপায়ে গম্ভীরায় যাইয়া দেবীর চরণে অঞ্জলি দিতে হইবে। এইরূপ মনস্থ করিয়া পাণ্ডাদের বিনয়পূর্ব্বক বলিলাম —আমাদের অনুগ্রহ করিয়া গম্ভীরায় প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। অন্যথায় আমরা জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে বাধ্য হইব। তাহারা একথা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া গম্ভীরার দ্বারে দুইটি তালা লাগাইয়া দিল। ইহাতে আমরা নিরুপায় হইয়া ৺মাকে মনে মনে স্মরণ করতঃ যেমনি তালা ধরিয়া জোরে টান দিলাম, অমনি তালা দুইটি খুলিয়া গেল। এইভাবে চারিজনে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহা দেখিয়া পাণ্ডাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া তাহারা পুলিশে সংবাদ দিল। আমরা এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দেবীর স্তব আরম্ভ করিলাম। এত গোলমালের মধ্যেও অঞ্জলি দিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব কোথায় পুষ্পাঞ্জলির পুষ্প ইত্যাদি পাওয়া যায় ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির পিছন দিক হইতে একটি মেয়ে হাত বাড়াইয়া পুষ্পপত্রাদি দিল কিন্তু অঞ্জলি দেওয়ার পর আর ঐ মেয়েটিকে মন্দিরে দেখিতে পাইলাম না। পাণ্ডারা আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বাহিরে আসিলে পাণ্ডা

ও পুলিশরা আমাদের বলিল—বেআইনী কাজ করিলে কেন? আমরা বলিলাম—এ দেবী সর্ব্বসাধারণের জন্য, কিন্তু পাণ্ডাজীরা যাত্রীদের উপর পয়সা আদায়ের জন্য, অত্যন্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্য করিয়াছি। পাণ্ডাজীরা যদি এ বিষয়ে বেশী কিছু বলেন তাহা হইলে দেবীকে পাণ্ডাদের কবল হইতে তুলিয়া অন্যত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ কথা শুনিয়া আর কেহ কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। এখানকার এ পরীক্ষায় জয়ী হইতে দেখিয়া মহারাজ সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

পরদিন খিদিরপুরে ভূ-কৈলাসের বৃহৎ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। ইহার পর আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করিতে রওনা হইলাম। তখন সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট নানা উপদেশ শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সেস্থানের নীরবতায় ও গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাসে অল্পক্ষণের মধ্যেই মনে এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত ভাবের উদয় হইল। এখান হইতে বৈকালে ষ্টীমারযোগে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম।

রাণী রাসমণির মন্দির ও দেবসেবার ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম রাণী যে ধর্ম্মশীলা নারী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির, রাধাগোবিন্দের মন্দির ও বৃহৎ আঙ্গিনার পর গঙ্গাতীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিবের দ্বাদশ মন্দিরের শোভা এক অভিনব দৃশ্য! অপরদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

সিদ্ধস্থান পঞ্চবটী প্রভৃতি দর্শনে এক দিব্যভাবে অন্তর ভরিয়া উঠিল। এখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিবস গঙ্গাস্নানান্তে দেবীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। বিশ্রামান্তে বাসায় ফিরিলাম। পরদিবস কলিকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বৈকালের ট্রেনে সকলে মিলিয়া পুরী যাত্রা করিলাম।

পুরী

পুরী ঃ—আজ যে মহাতীর্থ সম্বন্ধে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা একসময়ে যে কি দুর্গম ছিল তাহা কল্পনাতীত। যখন রেলপথ বা জাহাজ ছিল না তখন কত শত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী স্ব স্ব প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্থলপথে জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিত। এখন রেলপথ হওয়াতে তীর্থ যাত্রীদের দীর্ঘ ও দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে।

পুরী ষ্টেশনে ট্রেণ আসিবামাত্র পাণ্ডাদের যাত্রী সংগ্রহের জন্য কলরব আরম্ভ হইল। মহারাজ পাণ্ডা ঠিক করিলে আমরা গাড়ী করিয়া সহর অভিমুখে গমন করিলাম। দূর হইতেই সমুদ্র হইতে আগত বাতাস যেন আমাদিগকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইতেছিল। দূর হইতে শ্রীমন্দিরের উচ্চ পতাকা দর্শনে মনপ্রাণ যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে গোয়েঙ্কার ধর্ম্মশালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ম্যানেজার দুইটি বড় ঘর আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তথায় জিনিষপত্র রাখিয়া সমুদ্র স্নানের জন্য বাহির হইলাম।

সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া তাহার বিশালত্ব দেখিয়া মনে হইল যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি না জানি কতই মহান। পুরীর একদিকে হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমন্দির উন্নতশিরে ভক্তগণকে আহ্বান জানাইতেছে, অপরদিকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ বালুকাসৈকতে যেন শ্রীদেবের চরণে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে টাইয়া পড়িতেছে। রবি কিরণ প্রতিফলিত নীলাম্বর অফুরন্ত উর্ম্মিমালা যেন সেখানে আহ্বান করিতেছে—হে জনমণ্ডলী! এস, আমার সৈকতে বসিয়া নির্ম্মল সমীরণে তোমাদের তাপিত প্রাণ শীতল কর। সমুদ্রের উপর সূর্য্যের উদয়াস্ত কালীন দৃশ্য এক অপূর্ব্ব শোভা।

কতকগুলি গলিপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিক হইতে জনমণ্ডলী জলস্রোতের ন্যায় সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতেছে। সিংহদ্বারের সম্মুখে লৌহবেষ্টিত একটি স্তম্ভ। তাহার নাম অরুণ স্তম্ভ। উহার উপরিভাগে অরুণদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দির যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম নীলাচল। চারিদিকে চারিটি প্রবেশদ্বার আছে। উত্তরদ্বারে প্রস্তর হস্তি আছে বলিয়া ইহার নাম হস্তিদ্বার। এইপ্রকার দক্ষিণে অশ্বদ্বার, পূর্ব্বে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার। প্রবেশের জন্য সিংহদ্বারই প্রশস্ত। সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহমূর্ত্তি ও দ্বারী জয় বিজয়রূপে দণ্ডায়মান। পথের দুই দিকের বিপণী শ্রেণীতে শুষ্ক মহাপ্রসাদ ও রাজভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়। পথ শেষ হইলে প্রাঙ্গন। মন্দির চারি অংশে বিভক্ত। প্রথমে

ভোগমণ্ডপ, দ্বিতীয় নাটমন্দির, তৃতীয় মোহন মণ্ডপ ও চতুর্থ গর্ভ মন্দির। এই চারি অংশ পরস্পর সংলগ্ন। মন্দির অভ্যন্তরে পূর্ব্ব ভাগে গরুড় স্তম্ভ। দেয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতীয় কতকগুলি মূর্ত্তি তৈলচিত্রে অঙ্কিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য গীতবাদ্য হইয়া থাকে। নাটমন্দির হইতে জগন্নাথদেবের দর্শন হয়। গর্ভ মন্দির এস্থান হইতে একটু দূরে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। কয়েকটি ঘৃত প্রদীপের আলোর সাহায্যে বিগ্রহ দর্শন পাওয়া যায়।

নাটমন্দিরের পর মোহনমণ্ডপ। যাত্রীরা নাটমন্দির অতিক্রম করিয়া "মোহনে" প্রবেশ করে। জনস্রোত রোধের জন্য এই "মোহনে" দুইটি প্রকাণ্ড অর্গল এবং দক্ষিণদিকে একটি দরজা আছে। একদল যাত্রী মূল মন্দির হইতে ঐ দরজা দিয়া বাহির হইতেছে, অপর দলকে অর্গল খুলিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে নিত্য মন্দির অভ্যন্তরে বহু যাত্রীর প্রাণনাশ হইত। শ্রীমূর্ত্তি তিনখানির মধ্যে প্রথমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, মধ্যস্থলে সুভদ্রা, তাহার পার্শ্বে বলরাম, তিনখানি মূর্ত্তিই দারুময়। পাণ্ডারা এই মূর্ত্তিকেই বিভিন্ন সাজে নানা রত্ন অলঙ্কারে ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া ভক্তমণ্ডলীর তৃষিত প্রাণে আনন্দ বারি সিঞ্চন করিয়া থাকে কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ আসে তাঁহার মহিমায়। বিশেষ উৎসব ও পর্ব্ব দিনে শৃঙ্গার বেশকালে স্বর্ণনির্ম্মিত হস্তপদ শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে। বস্তুতঃ মহাবিষ্ণুর এই দারুময় মূর্ত্তির প্রকৃত তত্ত্ব অতি অল্প লোকেই

উপলব্ধি করিতে পারে। ভক্তের ভগবানকে একমাত্র ভক্তই চিনিতে পারেন। মহাপ্রভু এই নির্ব্বিকার মূর্ত্তিতেই মহাবিষ্ণুরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়া লক্ষ্য করিয়া শত শত ভক্তের যে প্রাণস্পর্শী "হা জগন্নাথ!" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকে, যাত্রীদের মধ্যে আবাল, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধনের মুখে যে এক নাম "জয় জগবন্ধু", ইহা শ্রবণে নাস্তিকের হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। কাহারও মধ্যে মান, অপমান, লজ্জা. ভয় দেখা যায় না। সকলেই যেন আত্মহারা হইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। সকলেরই লক্ষ্য এক, আকাঙ্খা এক—কেবল দেব দর্শন!

জীব সেই অমৃত সাগরের লহর মাত্র। সাময়িক প্রলোভনে নিজেকে পৃথক মনে করিয়া সুখের আশায় সংসারে প্রবেশ করিয়া দুঃখকে সুখরূপে বরণ করে; কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই অধিক পায়। তাই অস্থির হইয়া শান্তির আশায় জগতে বিচরণ করে। যেমন নদনদী উৎপত্তি স্থান হইতে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাগরে যাইয়া মিলিত হয় তেমনই জীবগণ সংসারে প্রবেশ করিয়া নিয়ত কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। তাহাদের আলস্য নাই, কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া কি এক বস্তু লাভের জন্য চলিয়াছে। নদী যতক্ষণ ধরণীবক্ষে প্রবাহিত হয় ততক্ষণই তাহার নামরূপ থাকে, সমুদ্রে যাইয়া পড়িলে আর তাহা থাকে না সমুদ্রেই সমস্ত লয় হয়. সেইরূপ জীব আনন্দ আস্বাদনের জন্য কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন ব্রহ্মারূপ সাগরে যাইয়া মিলিত হয় তখন তাহারও নামরূপ সেই

অনন্ত সত্ত্বায় বিলীন হইয়া যায় ও সে কর্ম্মের গতি হইতে নিষ্কৃতি পায়।

এই মহাতীর্থে দারুময় মূর্ত্তি সকলকেই সমানভাবে আনন্দ দান করেন। তবে উহা গ্রহণের তারতম্য ও মনোভাব অনুযায়ী লাভ হইয়া থাকে। যেমন বায়ু প্রবল হইলেই জলাশয়ে তরঙ্গ উঠে কিন্তু তাহার আকার ও গভীরতা ভেদে তরঙ্গের আকার ছোটবড় হয়, তেমনি পরমাত্মার প্রতীক শ্রীজগন্নাথের সম্মুখান হইবামাত্র হৃদয়ে আনন্দ হিল্লোল উত্থিত হয়। ভক্ত যেরূপ ভগবানের দর্শন স্পর্শন দ্বারা আনন্দ পরায়ণ ভগবানও সেরূপ ভক্তের ভক্তিতে বশ হইয়া মনোবাঞ্ছিত ফলদান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার সূক্ষ্ম ও বৃহৎ। দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাদি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং মনুষ্যের পঞ্চভৌতিক শরীর সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ড। মানুষ স্বভাবতঃ সূক্ষ্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বৃহত্তের প্রতি লক্ষ্য করে কিন্তু সূক্ষ্মই বৃহতের মূল। যেমন অশ্বত্থ বীজ যতই ক্ষুদ্র হউক না তাহার ভিতরে সূক্ষ্মাকারে সেই বৃহতের শক্তি ও আকার নিহিত আছে, তেমনই এই ক্ষুদ্র শরীরই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ। ইহার ভিতরে পরমাত্মা চিৎকণারূপে বর্ত্তমান। আত্মা অসীম ও অনন্ত, জীব সসীম ও সীমাবদ্ধ। পরমাত্মা নির্গুণ, সুখ দুঃখের অতীত; জীব সগুণ, সুখদুঃখে আবদ্ধ। আত্মা মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং বিভুরূপে বর্ত্তমান; জীব মায়ার কুহকে পড়িয়া সংসারে ভ্রাম্যমান। মানুষের এই দেহেই অনল, গরল ও সুধা

প্রভৃতির স্থান। ইহা অনুভব করা অবশ্য সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। নিবিষ্ট মনে চিন্তা দ্বারাই ভক্ত তাহার হৃদসাগরের মনোময় কল্পদ্বীপে জগৎপতি নারায়ণকে দর্শন করিতে পারে।

ভগবৎ সেবা দুই প্রকার—এক ধ্যান যোগে, অপর বাহ্যভাবে মূর্ত্তিতে সেবা। এই উভয় প্রকার সেবার মধ্যে অন্তর ভাবই শ্রেষ্ঠ। সাধক অন্তর্দৃষ্টি বলেই পরমাত্মার সক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। বাহ্যিক সেবা অন্তর্লক্ষ্যের সহায়তা করে। মনের স্থিরতা লাভ না হইলে অন্তর বাহির কোনটিই শুদ্ধ হয় না। মনই সমস্ত ভাব ও অভাব অনুভব করে। এই মনের স্থিরতা লাভের জন্যই তীর্থ ও উপাসনা প্রচলন হইয়াছে। পুরীতে মহামায়া তিনভাবে তিন মূর্ত্তিতে বিরাজমান। যথা—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এই তিন শক্তি দ্বারা তিনি জীবকে পালন করিতেছেন। জীবের শারীরিক ও মানসিক বশদায়িনী মহাকালী, ধনদায়িনী মহালক্ষ্মী এবং জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী। দেহী মাত্রেরই এই ত্রিশক্তির আবশ্যক। এ ত্রিশক্তি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মধ্যে অধিষ্ঠিতা। মহাকালী বিমলাদেবীরূপে স্বতন্ত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি সহ ভগবানের সাকার উপাসনার বৈশিষ্ট্যই এই বিরজাক্ষেত্র।

অনেকের হয়ত মনে হইতে পারে যে নিজের মধ্যেই যখন পরমাত্মার অধিষ্ঠান তখন আর নানা কষ্ট ও আপদ বিপদকে বরণ করিয়া ভগবানের প্রতিকৃতি দর্শনের জন্য তীর্থাদি দর্শনের প্রয়োজন কি। কিন্তু এই ভাব মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে আসা

ঠিক নহে। বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্যই তীর্থাদি আবশ্যক। যাহাদের অন্তর বাহির ঈশ্বরময় হইয়া গিয়াছে তাহারা মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তীর্থ শ্মশান ও সংসার তিনই সমান। যাহারা মায়ামোহে জড়িত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে তাহাদের স্বীয় কর্ম্মের ক্ষয় হইবার জন্যই তীর্থ ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদি প্রয়োজন। ইহা দ্বারাই কামনার ক্ষয় ও মুক্তির উপায় হয়। সংসারী জীবের পক্ষে তীর্থ দর্শন ও সাধুসঙ্গ হৃদয়ের অন্ধকার নাশক ও জ্ঞানপ্রকাশক। মহতের আশীর্ব্বাদ ও ঈশ্বরের কৃপা একত্র হইলেই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। মহাত্মা ব্যক্তিই মুক্তির পথ প্রদর্শক।

তাহাদের জ্ঞান, তিতিক্ষা ও প্রেম জীবের ভাগ্যক্রমে লাভ হয়। আশ্রম ও তীর্থাদি দর্শন দ্বারাই এই সমস্ত যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

দেবদর্শন ও পরিক্রমণ

দেবদর্শন ও পরাক্রমণ ঃ—দেবদর্শন ও পরিক্রমন মানসে মূলমন্দির হইতে প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া দেখা গেল সম্মুখস্থ মণ্ডপে পণ্ডিতগণ বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেছেন। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে গৃহগুলিতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিমলাদেবীর মন্দিরে যাইবা পথে অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করিলে মোহনের গাত্রে কতকগুলি অশ্লীল প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়।

বিমলার মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীবিমলাদেবী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, রাধা, সর্ব্বমঙ্গলা, কালিকাদেবী, গুণ্ডিকাদেবী ও সুভদ্রা—এই অষ্টশক্তি সহ পুরুষোত্তম বিরাজিত। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রধান

কয়েকটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে; যথা—ক্ষেত্রপাল, সূর্য্য, বটেশ্বর, মঙ্গলা, বটকৃষ্ণ, বিমলা, গণেশ, নৃসিংহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মাখনচোরা, গোপীনাথ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণপটলেশ্বর, জগন্নাথ, সূর্য্যনারায়ণ, চৈতন্যদেব, রাধাশ্যাম ও বদরিনারায়ণ।

দৈনিক পূজা, শৃঙ্গার ও ভোগ

দৈনিক পূজা, শৃঙ্গার ও ভোগ ঃ—রাত্রি চারি ঘটিকায় দেব জাগরণের জন্য তুন্দভিধ্বনি হয়। পরে মঙ্গলারতি, বেশ পরিবর্ত্তন ও বাল্যভোগ হয়। মঙ্গলারতি দর্শনার্থীরা পূর্ব্বে পাণ্ডার সাহায্যে মন্দিরের ম্যানেজারের নিকট আবেদন জানাইলে ঐ সময় প্রবেশ অধিকার পাওয়া যায়। বেলা দশটার সময় অবসর শৃঙ্গার। আরতি, খিচুরি ও পিঠার ভোগ হয়। মধ্যাহ্নে প্রহর শৃঙ্গার। আরতি ও নানা অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ হইয়া শয়ন হয়। তৎপরে বেলা চারিটায় নিদ্রাভঙ্গের পর জিলাপি ভোগ হইয়া থাকে। সন্ধ্যায় চন্দন শৃঙ্গার, আরতি ও বহুপ্রকার মিষ্টান্ন ভোগ হয়। রাত্রিতে বড় শৃঙ্গার, আরতি ও রাজবাড়ীর গোপালের ভোগ দ্বারা জগন্নাথ দেবের ভোগ হয়। তারপর এক ঘণ্টাকাল দেবদাসীর নৃত্যগীতাদি হইয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়।

মহাপ্রসাদ

মহাপ্রসাদ ঃ—জগন্নাথ দেবকে যে সমস্ত ভোগের দ্রব্যাদি নিবেদিত হয় তাহাই বিমলাদেবীর ভোগে অর্পিত হয় বলিয়া

তাহার নাম "মহাপ্রসাদ"। জগন্নাথদেবের ৫৬ প্রকার ভোগ হয়। সমস্ত ভোগই মন্দিরমধ্যে রন্ধনশালায় প্রস্তুত হয়। কেবল গোপবল্লভ ও রাজভোগ রাজবাড়ী হইতে আনীত হয়। এই প্রসাদ দ্বারা দৈনিক প্রায় দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। আর কোন তীর্থেই এরূপ বিপুল ভোগরাগের আয়োজন নাই। এখানে যতপ্রকার ভোগ আছে তাহার মধ্যে অন্নপ্রসাদই প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই—মহাপ্রসাদের এরূপ মাহাত্ম্য যে ইহা ভক্ষণে সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য—মহাপ্রসাদ শুষ্ক, পর্য্যুসিত ও দূর হইতে আনীত যে প্রকারেই হউক না প্রাপ্তিমাত্র গ্রহণ করিবে। এই মহাপ্রসাদ নিত্য আনন্দবাজারে বিক্রয় হয়। আচণ্ডাল সকলেরই এখানে সমান প্রবেশাধিকার আছে। আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদের বিপুল অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় মহালক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। এই পুরীধামে উচ্চনীচ সকলেই শবর জাতির প্রস্তুত মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

উৎসব বা পার্ব্বণ

উৎসব বা পার্ব্বণ ঃ—(১) জগন্নাথ দেবের বারমাসে তেরো পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসে শুক্লা অষ্টমীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। (২) জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে রুক্মিণী হরণ। ঐ দিবস জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি গুণ্ডিচা উদ্যানে যাইয়া রুক্মিণী হরণপূর্ব্বক মন্দিরে প্রত্যাগমন

করিয়া বিবাহ করেন। (৩) জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নানবেদীর উপরে মুর্ত্তিত্রয়কে আনয়নপূর্ব্বক রোহিণী কুণ্ডের জলে স্নান করান হয়। (৪) আষাঢ় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রার বিরাট উৎসব হয়। পুরীতে এই রথযাত্রাই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। ঐ সময় অসংখ্য লোক সমাগম হয়। প্রতিবৎসর তিনখানি নূতন রথ নির্ম্মিত হয় এবং উৎসবান্তে তাহা ভাঙ্গিয়া জগন্নাথের ভোগ রন্ধনের জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। এই রথের ১৬ খানি চাকা, উচ্চতায় ৩০ হাত, নাম 'নন্দীঘোষ রথ'। বলরামের রথ ১৪ চাকার, উচ্চতায় ৩০ হাত, নাম 'তালধ্বজ'। সুভদ্রার রথ ১২ চাকার, উচ্চতায় ২৯ হাত, নাম 'পদ্মধ্বজ রথ'। একশত হস্ত পরিমিত নারিকেলের রজ্জু দ্বারা প্রত্যেকখানি রথ টানা হয়। রথ নানা চিত্রে অঙ্কিত এবং বহিরাবরণের জন্য পীত, হরিৎ ও কৃষ্ণবর্ণের বনাত ব্যবহৃত হয়। (৫) অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষীয় তরুষষ্ঠী দিবসে 'ঘরখালি' উৎসব হয়। (৬) পৌষমাসে পূর্ণিমা তিথিতে অভিষেক হয়। (৭) মকর সংক্রান্তিতে মকর উৎসব। (৮) মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে গুণ্ডিচা উৎসব। (৯) মাঘী পূর্ণিমায় সমুদ্র জলে ভোগমূর্ত্তির স্নান ও তর্পনাদি কার্য্য হয়। (১০) ফাল্গুনি পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব হয়। এই সময়ে পুরীর রাস্তা এমনকি বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত আবিরে রঞ্জিত হয় (১১) চৈত্র মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে দমনকভঞ্জিকা উৎসব। (১২) শুক্লা নবমীতে শ্রীরামনবমী উৎসব হয়। (১৩) অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে 'চন্দনযাত্রা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভদ্রকালী

ভদ্রকালী :—দক্ষকন্যা সতীর দেহ হইতে ভদ্রকালী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। মহিষাসুর বধে দেবীর সহস্রভূজা মূর্ত্তিই ভদ্রকালী বলিয়া উক্ত। অসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কাত্যায়নীর স্তবে এই ভদ্রকালীর আরাধনা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও কয়েকটি তীর্থে ভদ্রকালী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাহা কোথাও ষোড়শভুজা, কোথাও অষ্টাদশভুজা, কোথাও বা চতুর্ভুজা এবং উগ্রমূর্ত্তি বিশিষ্টা ও নানা অস্ত্রাভরণে ভূষিতা কিন্তু এখানে ভদ্রকালী শান্ত, স্নেহাননা, সহাস্যবদনা।

বিমলা

বিমলা :—বিমলাদেবীর মন্দির বিশেষ কারুকার্য্য বিশিষ্ট ও অতি প্রাচীন। প্রবাদ—সতীর নাভিদেশ এস্থানে পতিত হওয়ায় ৫২ পীঠের মধ্যে ইহাও অন্যতম। তান্ত্রিকেরা বিমলাদেবীকে জগন্নাথের শক্তি বলিয়া গণ্য করেন। মহাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে ধীবরগণ নরেন্দ্র সরোবর হইতে মৎস্য ধরিয়া দেবীর ভোগে নিবেদন করে।

সিদ্ধ বকুল

সিদ্ধ বকুল :—সমুদ্রে যাইবার পথে একটি বাড়ীর মধ্যে এই বৃক্ষটি অবস্থিত। একটি চতুষ্কোণ বেদীর উপরে বৃক্ষটি স্থাপিত। ইহার তলদেশ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত সারশূন্য ও ত্বকের উপর ভর দিয়া ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় আছে। এরূপ অবস্থায়ও সবুজ

সুন্দর পত্রাবলী পরিশোভিত হইয়া বৃক্ষটি সজীব রহিয়াছে। প্রবাদ আছে—পরম বৈষ্ণব হরিদাস বাবাজী এই বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবও কখন কখন এই বৃক্ষমূলে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন।

কেশব মিশ্রের মঠ

কেশব মিশ্রের মঠ ঃ—সিদ্ধবকুল যাইবার পার্শ্ববর্ত্তী গলির মধ্যে এই মঠ স্থাপিত। এ মন্দিরে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকা, কাঁথা ও কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। দর্শক ইচ্ছুক হইয়া প্রবেশ করিলে ইহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিতে দেয়।

শ্বেতগঙ্গা

শ্বেতগঙ্গা ঃ—শিবমন্দির হইতে উত্তরদিকে শ্বেতগঙ্গা অবস্থিত। ব্রহ্মপুরাণাদিতে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ইহার জলের রং সবুজ ও দুর্গন্ধযুক্ত, তথাপি যাত্রীগণ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য ইহাতে অবগাহন করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করেন। ইহার তীরে শ্বেত মাধব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অলাবুকেশ্বর

অলাবুকেশ্বর ঃ—শাস্ত্রে না কি আছে যে, এই লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলে অপুত্রক পুত্রবান হয় এবং কুৎসিৎও সুন্দর হয়।

যমেশ্বর

যমেশ্বর ঃ—শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে এই মন্দির অবস্থিত। মহাদেব যমরাজের সংযম ভঙ্গ করিয়া যমেশ্বর নামে

খ্যাত হইলেন। প্রবাদ আছে—এই লিঙ্গমূর্ত্তির আরাধনা করিলে যমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

কপালমোচন

কপালমোচন ঃ—অলাবুকেশ্বরের নিকটে কপালমোচন মন্দির অবস্থিত। এই মূর্ত্তি দর্শনে মহা পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র সরোবর

নরেন্দ্র সরোবর ঃ—মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বড়দণ্ডী রোডের পার্শ্বে এই সরোবরটি অবস্থিত। ইহার চারিদিকে সোপান শ্রেণী, ভিতরে দুইটি কৃত্রিম দ্বীপ আছে। তদুপরি কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। 'চন্দনযাত্রার' সময় এই সরোবরের মন্দির মধ্যে জগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক একুশ দিবস ব্যাপী উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বহু যাত্রী সরোবরে স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সরোবরটি অতি প্রাচীন ও গভীর বলিয়া কুমীরের আবাসস্থল ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় উৎসবের সময় কয়েকটি মানুষকে কুমীরে লইয়া গিয়াছিল। সেজন্য চন্দনযাত্রার সময় নিত্য দুইখানি নৌকা ভর্ত্তি হলুদের গুড়া ঘাটের নিকট জলে ছড়ান হয়। উৎকল দেশে অধিকাংশ জলাশয়ে কুমীরের বাস বলিয়াই বোধ হয় ঐ দেশবাসীরা স্নানের পূর্ব্বে তৈল ও হলুদ মাখিয়া অবগাহন করিয়া থাকে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ঃ—মন্দিরের প্রায় দুই মাইল দূরে এই সরোবরটি অবস্থিত। এখানে স্নান ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। সরোবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদের গাভী দান উদ্দেশ্যে এইখানে সেই সকল গাভী রাখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্ষুরাগ্রভাগ হইতে যে গর্ত্ত হয়, বৃষ্টির জলে তাহা একটি সরোবরে পরিণত হইয়াছে। ইহা কচ্ছপে পূর্ণ। ইহার দক্ষিণে নৃসিংহ ও পশ্চিমকূলে নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দির অবস্থিত।

আঠার নালা

আঠার নালা ঃ—পুরী সহরের উপকণ্ঠে ঘুটিয়া নামক নদীর উপর যে সেতু আছে তাহার নাম আঠার নালা। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য রাজা মৎসকেশরী এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেতুটির আঠারটি নালা আছে বলিয়া এই নাম। প্রবাদ আছে যে, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা সেতু নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে রাজা নিজের আটটি সন্তানের মস্তক দান করিয়াছিলেন।

লোকনাথ

লোকনাথ ঃ—শ্রীক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে সমুদ্রের সন্নিকটে এই মন্দির অবস্থিত। স্থানটি বালুকাময়

পদব্রজে অথবা গোযান ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোন উপায় নাই। স্থানটি অতি নির্জ্জন, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। লোকনাথ বিশেষ জাগ্রত দেবতা। কোন ত্রুটী হইলে বা অশুচি অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিলে না কি অনিষ্ট হয়। প্রবাদ—এই মন্দির শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গটি সমতল ভূমি হইতে দশফিট নিম্নে একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটি সর্ব্বদা জলে নিমগ্ন থাকে। শিবরাত্রির সময় এই জল সেচন করিয়া পুষ্করিণী সংযুক্ত কৃত্রিম উৎসের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও শিবলিঙ্গটিকে চন্দনাদিতে ও পুষ্পাভরণে শোভিত করিয়া পূজা সমাপন করা হয়। বৎসরান্তে ঐ সময়ে মূর্ত্তির ভালরূপে দর্শন পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রপাল

ক্ষেত্রপাল :—ক্ষেত্রপাল শাক্তদিগের উপাস্য দেবতা। অপদেবতা ও অনিষ্টকারী দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য এই দেবতা নগরের উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ, অষ্টভূজ ও ত্রিনেত্র। স্কন্ধদেশে নাগ, যজ্ঞোপবীত ও শিরদেশ মুণ্ডমালায় শোভিত।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ ও মন্দির :—ক্ষেত্রপালের নিকটেই মার্কণ্ডেয় হ্রদ ও মন্দির অবস্থিত। মহর্ষি মার্কণ্ড, মহাপ্রলয়ের সময় প্রলয়পয়োধিজলে সন্তরণকালে পুরীতে একটি বটবৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে পত্রোপরি শায়িত নবজলধরজ্যোতির্ম্ময়রূপে এক শিশুকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন যে, প্রলয়ের

জলস্রোত অতি বেগে শিশুর মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহা দেখিতে দেখিতে প্রলয়ের জল শোষণ হইলে ঐ স্থানে মার্কণ্ড তীর্থস্থাপনপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি রক্ষা করেন। বটবৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান ও অক্ষয়বটরূপে প্রসিদ্ধ। হ্রদোপরি মার্কেণ্ডয় শিব ও কয়েকটি শক্তি মন্দির স্থাপিত আছে।

গুণ্ডিচাগড়

গুণ্ডিচাগড় ঃ—গুণ্ডিচাগড় বা গুঞ্জবাড়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যান ভবন। নানা ফুল ফলে বৃক্ষাদি পরিশোভিত। গুঞ্জবাটি শ্রীমন্দিরের ন্যায় পবিত্র। এখানে তিনটি রত্নবেদী আছে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া এই গুণ্ডিচাবাড়ীতে আসিয়া সাতদিন বাস করেন। চলিত কথায় গুণ্ডিচাগড়কে জগন্নাথের মাসিবাড়ী বলে। লৌকিক প্রবাদ মতে গুণ্ডিচাদেবী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহধর্ম্মিণী ও তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার মন্দিরটি ছোট হইলেও ইহার রন্ধনশালা শ্রীমন্দিরের রন্ধনশালা হইতেও বৃহৎ, কারণ রথযাত্রার সময় পুরীতে যে লক্ষাধিক লোকসমাগম হয় তাহাদের উপযুক্ত ভোগের প্রসাদ এখানেই প্রস্তুত হয়। শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী সাতদিন অবস্থানের পর শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আটকে বন্ধন

আট্‌কে বন্ধন ঃ—এই আট্‌কে বন্ধন পুরীতে চিরপ্রসিদ্ধ। যাত্রীদের ইহাতে তেমন ইচ্ছা না থাকিলেই পাণ্ডাদের অত্যধিক

আগ্রহে আট্‌কে বাঁধিতে বাধ্য হয়। যাত্রীরা দেবদর্শনে যাইয়া অনেকেই প্রায় পাণ্ডার আশ্রয়ে থাকে। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঋণ করিয়াও পাণ্ডাদের হাতে আট্‌কে বন্ধনস্বরূপ নগদ কিছু অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার আট্‌কে বন্ধনের অর্থ প্রায়ই পাণ্ডাদের হস্তগত হইয়া থাকে। যাহারা এ কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের ইহার নিয়ম জানিয়া করা উচিত। মন্দিরের বাহিরে জগন্নাথের কাছারি-বাড়ীর খাতায় টাকা জমা দিলে উহা দেবভাণ্ডারে জমা হয়। ইহা হইতেই পাণ্ডারা কিছু কমিশন পাইয়া থাকে। আট্‌কে বন্ধনের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য যথাশক্তি বন্দোবস্ত করা।

পুরীর একটি ঘটনা

পুরীর একটি ঘটনা ঃ—পুরীতে দর্শনীয় বিষয় শেষ হইলে আমাদের একদিন ইচ্ছা হইল সমুদ্রে ঢেউ লইয়া স্নান করিব। সাতার জানা থাকিলেও সমুদ্রের প্রকৃতি না জানায় গভীর জলে যাইয়া ঢেউ লওয়ার প্রস্তাব সহসা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আপন মনে সাগরের তরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের একটি সঙ্গী আমাকে এই বিষয়ে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল—এই দেখ ফলটি সাগরে দেওয়া মাত্র ঢেউতে তীরে ফিরিয়া আসিল! আমি বলিলাম—জলে ভাসমান বস্তুকে ঢেউএ তীরে লইয়া আসাই স্বাভাবিক; কিন্তু গভীর জলে যাইয়া পড়িলে কখনই তীরে নিক্ষেপ করিবে না। তখন সাগরের

অতল গর্ভে আকর্ষণ করিয়া লইবে। মহান্ বস্তুর আকর্ষণ অতলে থাকাই স্বাভাবিক! এ কথায় সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধীর ভাবে আমাদের তিনজনকে টানিয়া জলে নামাইল। নদ নদীর স্রোতের একটা গতিবিধি জানা থাকিতে পারে, কিন্তু বিশাল সমুদ্রের গতি বুঝিয়া ঢেউ লওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দেখিতে দেখিতে পর পর ঢেউ আসিয়া আমাদিগকে অতল জলে নিয়া ফেলিল। ইহাতে ক্রমেই সকলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। এইরূপে কখনও গভীরের আকর্ষণে অতলে তলাইয়া যাইতেছি, কখনও বা উপরের দিকে ভাসিয়া উঠিতেছি। আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তীরের লোকে সহরে যাইয়া প্রচার করিল, চারিজন স্ত্রীলোক ঢেউ লইতে যাইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া মহারাজ স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডুবুরির সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু ডুবুরি না পাইয়া হতাশভাবে সমুদ্রতীরে বসিয়া পড়িলেন। যখন দেখিলাম, জলের আকর্ষণে কেবল তলাইয়া যাইতেছি, আর তীরের দিকে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, তখন পুরুষকার ত্যাগ করিয়া অতলে ডুবিয়া গেলাম। সেখানে অমানিশার ন্যায় ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না এবং বাঁচিবার শেষ চেষ্টায় একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে শরীরকে হাল্কা করা হইল। ইহাতে ঢেউয়ের আকর্ষণ উপরের দিকে ভাসাইয়া ক্রমে তীরে আনিয়া ফেলিল। সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় সঙ্গীদের তীরে আনিবার জন্য সাগরে নামিলাম। উহারা তখনও ঢেউএর তালে তালে উঠানামা করিতেছিল। এ অবস্থায়

তাহাদের চুল মুখে ধরিয়া একে একে তীরে লইয়া আসিলাম, কিন্তু লবণাক্ত জল অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করাতে সকলেরই প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা। সকলে একটু সুস্থ হইলে মহারাজ গাড়ী করিয়া আমাদের ধর্ম্মশালায় লইয়া আসিলেন। ইহার পর সহরে পরিচিত লোকেরা আমাদের দেখিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই কি করিয়া আমরা ডুবিয়া গিয়া বাঁচিয়া আসিয়াছি। আমাদের শরীরে এত জল প্রবেশ করিয়াছিল যে সাত দিন পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিলেই নাক ও কান দিয়া জল গড়াইয়া বাহির হইত।

সুস্থ হইয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করিল—সাগরে না নামিয়া তুমি কি করিয়া সাগরের গতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলে? উত্তরে বলিলাম—সাধনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিয়া বলিয়াছিলাম। প্রথমাবস্থায় বহু ক্রিয়াকর্ম্মের সাহায্যেও মনকে অন্তর্মুখীন করিতে পারা যায় না কিন্তু সাধনার অভ্যাসের ফলে যখন মন অভিপ্রেত স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তখন অধ্যাত্মের গভীরতর আকর্ষণে ইচ্ছা করিলেও আর সহজে বহির্মুখী হওয়া যায় না। অধ্যাত্মে সেই মহানের আকর্ষণ ও নিক্ষেপ এই দুইএর অনুভব দ্বারাই এ ধারণা আসিয়াছিল।

পুরীর রথযাত্রার একটি বিশেষ ঘটনা

পুরীর রথযাত্রার একটি বিশেষ ঘটনা :—রথযাত্রার বিপুল জনতা ভেদ করিয়া আমার পক্ষে রথে ৺জগন্নাথ দর্শন সাধ্যাতীত দেখিয়া দর্শনের আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলাম।

কিন্তু ভগবান ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী। তাই পুরীর হাকিম যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ী যায় সেই পথপার্শ্বস্থ একটি দ্বিতল বাড়ীর বারান্দা ঠিক করিলেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তথায় যাইয়া রথে শ্রীজগন্নাথ দর্শন মানসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই বারান্দার অতি নিকট দিয়াই প্রথমে বলরামের রথ পরে সুভদ্রার ও সর্ব্বশেষে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ দেখিলাম। এক অভিনব মূর্ত্তিতে জগন্নাথদেবের দর্শন পাইলাম। তাঁহার দেহের অনুপাতে মস্তক বেশ বড়, গায়ের রং যেন চাঁদের কিরণের ন্যায় শুভ্র, গলদেশে সাদা ফুলের মালা ; তিনি যেন হেলিয়া দুলিয়া আসিতেছেন। এই অপূর্ব্ব শোভামণ্ডিত রূপ দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম পূর্ব্বদিন কেন জগন্নাথ দেবের বর্ণ অন্যরূপ দেখিয়াছিলাম। সন্দেহ হওয়ায় বার বার ভাল করিয়া চোখ পুছিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতেও সেই একই রূপ দৃষ্ট হইল। ইহাতে বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম হয়ত কোন অপরাধের জন্য জগন্নাথ দেবের ঠিকরূপে দর্শন পাইলাম না। আমার পার্শ্বেই একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আমার মধ্যে দেবদর্শনের আনন্দের পরিবর্ত্তে বিমর্ষভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? উত্তরে আমার জগন্নাথ দর্শনের বিবরণ জ্ঞাপন করা হইলে, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে", এখন দেখিতেছি শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নয়, প্রত্যক্ষ। মনে হয় যাহার জন্মের কারণ নাশ হয় তাহারই রথে এই বামনরূপ দর্শন হয়। সাধুর মুখে এই আশ্বাস বাণী শুনিয়া আনন্দে অন্তর ভরিয়া উঠিল।

সাক্ষী গোপাল ও সত্যবাদী

সাক্ষী গোপাল বা সত্যবাদী :—যাত্রীগণের কণ্ঠনিঃসৃত ভগবানের জয়সূচক "জয় জগন্নাথ !" এই মঙ্গলধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেণখানি প্রভাতের আলোক ভেদ করিয়া পুরীধাম পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের লক্ষ্য বহুদূর হইলেও বিষাদের ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করিল। যাহা হউক, তাঁর স্মরণেই ঐ ভাবকে সম্বরণ করিয়া লওয়া হইল। সাক্ষীগোপাল পুরী হইতে বেশী দূর নহে। পথের দৃশ্য অনেকটা বাংলা দেশের ন্যায়। রেল লাইনের পাশ দিয়া সমান্তরাল ভাবে হাঁটাপথ চলিয়াছে। ইহার উভয়পার্শ্বে বট, অশ্বত্থ, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী ছায়া বিস্তারপূর্ব্বক দণ্ডায়মান। এই সকল দেখিতে দেখিতে যথাসময়ে ট্রেণখানি সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

ষ্টেশন হইতে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। রাস্তাটির উভয়পার্শ্বে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ। এখানে এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লওয়া হইল। ইহার অতি নিকটে চন্দন পুষ্করিণী। উৎকল দেশীয় প্রথা অনুসারে উহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ ও মন্দির অবস্থিত। 'চন্দনযাত্রা' উৎসবের সময় সাক্ষীগোপালজী এখানে জলবিহার করেন। ধর্ম্মশালার নিকটেই শ্রীমন্দির। গুপ্তবৃন্দাবন নামে একটি রমণীয় উপবন মন্দিরটির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। সমগ্র মন্দিরটির গঠনে উৎকল দেশীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দির দ্বারের সম্মুখে

একটি অখণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ বিরাজমান। মূল মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের প্রধান দেবতা সাক্ষীগোপালজী, তাহার বামপার্শ্বে শ্রীরাধারাণী, ও দক্ষিণে তৎপ্রিয়সখী ললিতাদেবী। প্রবাদ—গোপালজী বৃন্দাবন হইতে আনীত আর রাধামূর্ত্তি উড়িষ্যাবাসী নির্ম্মিত। দর্শনার্থে বাহিরে আসিলাম। মন্দিরের উভয়দিকে শ্রীরামজীর মন্দির অবস্থিত।

এখানে নানাপ্রকার মেওয়াফল, ক্ষীর ও চিনি সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার সুস্বাদু মোয়াদ্বারা গোপালজীর ভোগ হয়। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়, অন্নভোগ হয় না। এই সেবাপূজার জন্য জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় আটুকে বন্ধন করিতে হয়। যাত্রীরা পুরী গমনের সত্যতাস্বরূপ সাক্ষীগোপালের পাণ্ডার দ্বারা লিখিত একখানি চিঠি লইয়া থাকে এইজন্য টাকা জমা দিতে হয়। এখানকার দর্শন শেষ করিয়া রাত্রির ট্রেণে ভুবনেশ্বর রওনা হইলাম।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন ঃ—ভুবনেশ্বরের বিচিত্র প্রভাব স্বভাবতঃই মানুষের মনের গতিকে যেন অতীতের দিকে লইয়া যায়। মনে হয় কোন মুনির এক তপোবনে উপনীত হইয়াছি। বিন্দু সরোবরের তীরেই হরগোবিন্দের ধর্ম্মশালা। তথায় আশ্রয় লওয়া হইল। বিশ্রামান্তে বিন্দু সরোবরে স্নানাদি শেষ করিয়া সকলে পাণ্ডার সহিত দেবদর্শনে বাহির হইলাম। এখানকার পাণ্ডারা অতি ভদ্র। পাণ্ডাজী বিন্দু সরোবরের গুণ বর্ণন

করিতে লাগিলেন। সমস্ত তীর্থের বিন্দু বিন্দু বারিতে না কি বিন্দু সরোবর পূর্ণ করা হইয়াছিল। এই সরোবরটি ভুবনেশ্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির। সরোবরের পূর্ব্বদিকের একটি ঘাটের নাম মণিকর্ণিকা। একসময় উৎকল রাজগণ ভুবনেশ্বরকে দ্বিতীয় বারাণসীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নাম বর্ত্তমানে তাহারই সাক্ষ্য বিশেষ। এখানে বিন্দু সরোবরে বিধিমত মন্ত্রাদি দ্বারা স্নান ও তর্পণাদি করাই প্রধান কার্য্য। প্রথমে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে উপনীত হইলাম। তীর্থের প্রথানুসারে অনন্ত ও বাসুদেব অর্চ্চনা না করিয়া লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর দর্শন নিষেধ।

কিম্বদন্তি মতে লিঙ্গরাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব্বে অনন্ত ও বাসুদেব এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই বাসুদেবই শিবকে, এখানে গুপ্ত আবাস প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি করেন। উড়িষ্যার সমস্ত দেবমন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। এই মন্দিরের প্রধান দ্বার পশ্চিমদিকে। প্রবেশ দ্বারের বামভাগে তুইটি শিলালিপি রহিয়াছে, উহার অক্ষরগুলি প্রায় বাংলারই ন্যায়। উহা পাঠে জানা গেল, ভবদেব ভট্ট নামক জনৈক সাবর্ণ বংশের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রাঙ্গণের কোন কোন মন্দির একেবারেই ভগ্নপ্রায়। মূলমন্দিরের অবস্থা খারাপ হইলেও ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। দর্শনেই চোখ জুড়ায়। মন্দিরের ভিতরে অনন্ত, বলরাম, ও বাসুদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অন্ধকারের জন্য সকল মূর্ত্তি স্পষ্ট দর্শন হয় না। মূলমন্দিরের মধ্যে দিনেও রাত্রির ন্যায় অন্ধকার। লিঙ্গরাজের মূর্ত্তি প্রাঙ্গণভূমি অপেক্ষাও অনেকটা নিম্নে অবস্থিত এবং তাহার আকৃতি প্রদীপের মত। উহার গাত্র স্বর্ণপাত্রমণ্ডিত। দিবারাত্র সমানভাবে কয়েকটি প্রদীপ জ্বালান আছে, তাহা দ্বারা উহার মধ্যস্থলকে আলোকিত রাখিয়াছে। লিঙ্গমূর্ত্তির মধ্যস্থিত একটি শ্বেত রেখা উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একারণে পাণ্ডারা ইহাকে 'হরিহর' বলিয়া থাকেন। আবার ইনি কোটীলিঙ্গেশ্বর কৃত্তিবাস নামেও অভিহিত। এখানকার পূজা, ভোগ প্রভৃতির প্রথা পুরীর জগন্নাথদেবের অনুরূপ। তবে দেবদাসীর পরিবর্ত্তে নাটুয়াগণ এখানে নৃত্য করিয়া থাকে। পুরীর ন্যায় চন্দনযাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদি এখানেও নানাভাবে হয়। এখানে রথযাত্রা দুইসময়ে হয়—চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে এবং আষাঢ়মাসে। মন্দিরের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এখানেও একটি কার্য্যালয় আছে। তবে আটকে বন্ধনের প্রথা পুরীর ন্যায় ততটা বাধ্যতামূলক নহে। দেবদর্শনে অধিক বেলা হইয়া গেল। তাই ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া পাণ্ডাজীর আনীত অন্নপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম লইলাম।

বৈকালে আবার অন্যান্য মন্দিরাদি দর্শনের জন্য বাহির হইলাম। এখানেও অসংখ্য মন্দির আছে, তাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ভুবনেশ্বরের সকল মন্দির অপেক্ষা পরশুরামেশ্বরের মন্দির প্রাচীন এবং মুক্তেশ্বরের মন্দিরের কারুকার্য্য অতুলনীয়। পরদিবস গৌরীকুণ্ড নামে এক প্রস্রবণে স্নান করিতে যাওয়া

হইল। এই কুণ্ড কেদারগৌরী নামক মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। ইহার মধ্যে একটি প্রকৃত প্রস্রবণের জল সিংহমুখাকৃতি নালীর দ্বারা নির্গত হইয়া কেদারকুণ্ডের ভিতরে যাইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এই কুণ্ড তুইটি পাশাপাশি ভাবে বিদ্যমান। কুণ্ড যখন জলে পূর্ণ হইয়া যায় তখন উহার জলও আর একটি নালী দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর কুণ্ডে চলিয়া যায়। ঐ জল আবার নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে যাইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডটী সকলের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার ভিতরে অসংখ্য মৎস্য ক্রিড়া করিতেছে। গৌরীকুণ্ডের জল ধূসরবর্ণ এবং পানে অজীর্ণরোগ নিরাময় হয়। এই কুণ্ডের নিকটে আর একটি ছোট কুণ্ড আছে। ইহার জলের বর্ণ তুধের ন্যায়! একারণে ইহার নাম তুধকুণ্ড। এই জলও এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। এস্থানে সাতদিন অবস্থানের পর দাক্ষিণাত্যে রওনা হইলাম।

ওয়ালটিয়ার

ওয়ালটীয়ার ঃ—প্রভাতের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীখানি ওয়ালটীয়ার ষ্টেশনে পোঁছিল। ষ্টেশনটির চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। চারিদিকের উচ্চ পর্ব্বতগুলি যেন গর্ব্বিত মস্তকে অরুণালোককে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখানে সহজে কোন ব্যাধি স্থান পায় না। বহু রোগী এখানে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আসে এবং এখানকার জল হাওয়াতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরে। ট্রেন হইতে নামিয়া গোযানে সহর অভিমুখে গমন করিলাম। এখানকার কুলি, মুটে, গাড়োয়ান

ইংরাজি লেখা না শিখিয়াও ইংরাজি বলিতে পারে ; এ অঞ্চলে বাংলা এমনকি হিন্দী ভাষাও চলে না। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। সহরে যাইবার সময় পথপার্শ্বে যে সকল কুটীর দেখা গেল সেগুলির আকৃতি অনেকটা বাংলাদেশের ধানের মোরাই এর মত। ইহা তালপত্রে আচ্ছাদিত এবং দেখিতে গোলাকার। চালাগুলি প্রায়ই ভূমিচুম্বিত। ইহাদের একটি দরজা ব্যতীত আলোবাতাস প্রবেশের দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। উহার ভিতরেই আড়ম্বরহীন কৃষককুল ও চর্ম্মকার প্রভৃতি সপরিবারে সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করিতেছে। নানাপ্রকার দৃশ্যের মধ্য দিয়া একটি 'ছত্রমের' নিকট উপস্থিত হইলাম। এস্থানে যাত্রীদের তিনদিন বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়। তিনদিনের বেশী থাকিলে প্রতি ঘরের জন্য চারি আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়। হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতি এখানে স্থান পায় না। "ছত্রম্" বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তা ও জলের কল আছে। তবে পানীয় হিসাবে ইন্দারার জলই সুস্বাদু ও উপকারী। রন্ধনের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রয়োজন হইলে ম্যানেজারের নিকট বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায় এবং ছত্রম্ ত্যাগ করিবার সময় উহা রসিদ সহ ম্যানেজারকে বুঝাইয়া দিতে হয়। এখান হইতে বাজার বেশী দূর নহে। সাধারণ সকল দ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। এখানকার শ্রমিকরা প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ ; সামান্য কৌপীন দ্বারা লজ্জা নিবারণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা আঠার হাত কাপড় কাছা দিয়া পরিধান করে। অবগুণ্ঠন প্রথা নাই ; সেজন্য স্ত্রীলোকেরা

স্বচ্ছন্দ ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। যাহারা বিধবা তাহারাই মাত্র অবগুণ্ঠন দিয়া থাকে। এখানে দ্রব্যাদি ক্রয় করা বাঙ্গালীর পক্ষে একপ্রকার শাস্তি বিশেষ। দ্রব্যাদি ক্রয়ের দুইটি মাত্র উপায় আছে—এক ইহাদের ভাষা আয়ত্ত করা, অপর আবশ্যক দ্রব্য হস্তগত করিয়া একটি একটি করিয়া পয়সা গুণিয়া দেওয়া। ওয়ালটীয়ার শুভ্র বালুকামণ্ডিত হইলেও স্থানে স্থানে হিমালয়ের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায়। সমুদ্রগর্ভে ও উপকূলে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ স্থানের প্রায় তিনদিক পর্ব্বতবেষ্টিত। এ কারণে বায়ুর গতি কদাচিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পাহাড়ের ঝর্ণার জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া সহরে সরবরাহ করা হয়। এখানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোরম।

ওয়ালটিয়ার হইতে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত একটি রেললাইন সমুদ্রের কিনারায় ভাইজাক নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ দুইটিই প্রকৃত সহর। এখানে ফোর্ট, স্কুল, কাষ্টম হাউস, বালিকা বিদ্যালয়, ক্লাব প্রভৃতি আছে। পোষ্ট আফিস, লাইট হাউস সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে একটি পাহাড় দৃষ্টি অবরোধ করিয়া সাগর বক্ষে নামিয়া গিয়াছে। ইহার শৃঙ্গদেশে তিন ধর্ম্মের তিনটি মন্দির অবস্থিত। হিন্দুদিগের বেঙ্কটস্বামীর মন্দির, সিদ্ধপুরুষ দাগাসাহেবের সমাধির উপর স্থাপিত মুসলমানদের মস্‌জিদ এবং খৃষ্টধর্ম্মের রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা বর্ত্তমান। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ উপাসনার প্রথা অনুযায়ী বেদ, কোরাণ, এবং বাইবেল পাঠ করিয়া থাকে। এই পাহাড়ের উপরে একটি সমতল ভূমি

আছে। তাহাতে আরোহণ করিবার একটি পাকা রাস্তার উপর একটি পুরাতন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বর্ত্তমান। ইহার তলদেশে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত জীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। মনে হয় কোন সময় কোন মহাত্মা সাধুদের তপস্যার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থানটি অতি নির্জ্জন। ইহার সম্মুখে বিশাল ভারত মহাসাগরের উত্তাল নীলাম্বুরাশি দিগন্তবিস্তৃত। এখানে সাতদিন অবস্থান করিয়া আমরা "সীমাচলম্" যাত্রা করিলাম।

সীমাচলম্

সীমাচলম্ ঃ—ওয়ালটীয়ার হইতে 'সীমাচলম্' যাতায়াতের জন্য ঝট্‌কা, ব্যাণ্ডি ও মোটর পাওয়া যায়। পথের দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে 'সীমাচলম্' মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নৃসিংহদেবের পূজার যাবতীয় উপকরণ চুয়া, চন্দন, কুম্‌কুম্ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় হয়। প্রাঙ্গণ পার্শ্বে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। যাত্রীদের রান্না করিয়া খাওয়ার জিনিষ পত্রেরও ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মোহান্ত এক আনা দক্ষিণা লইয়া মন্দিরে প্রবেশের টিকিট দিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে ধ্বজস্তম্ভ বা সোনার তালগাছ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও প্রাচীন কারুকার্য্যে শোভিত। এস্থানের বিগ্রহ স্বর্ণাবৃত সিংহবদন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মূল মন্দিরে যাত্রীদের প্রবেশ বা পূজার অধিকার নাই। পূজার দ্রব্য পাণ্ডার হাতে দিয়া দর্শন করিতে হয়। এখানকার পূজার পদ্ধতি বাংলা দেশের ন্যায়

নহে। পূজার জন্য অখণ্ড ফল, কুম্‌কুম্, চন্দনকাষ্ঠ ও বস্ত্রাদি প্রশস্ত। বিল্বপত্রাদির জন্য মূল্য ধরিয়া দিতে হয়। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ বিল্বপত্রাদি বিগ্রহের চরণে নিবেদন করিয়া আরত্রিক করেন। যাত্রীগণ সেই আলোকে নয়ন ভরিয়া ভগবানের নৃসিংহরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়।

পুরাণে যে ভক্ত প্রহ্লাদের উপাখ্যানে নৃসিংহদেবের কাহিনী শুনিয়াছিলাম উহা প্রত্যক্ষ দর্শনে অন্তর আনন্দে পুলকিত হইল। ভক্তবৎসল হরি তাঁহার প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষার নিমিত্ত গর্ব্বিত দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার কামনায় ধরায় এই নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তিই এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহ পর্ব্বদিন ব্যতীত দর্শন পাওয়া যায় না; সর্ব্বদা চন্দনে আবৃত থাকে। বৎসরের মধ্যে শুধু অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দন ধৌত করিয়া বিগ্রহ স্নান করান হয়। সেই দিনই মাত্র উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিতে পান। মন্দিরে আরও কয়েকটি বিগ্রহ আছে; যথা:—লক্ষ্মীনারায়ণ, ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ, মাণিকেম্বা ও তারামূর্ত্তি আছে। ইহাদিগেরও যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। এখানকার দর্শন শেষ হইলে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইলাম!

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ:—মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণে বিস্তৃত বালুকাভূমি উত্তপ্ত। পক্ষিগণ উত্তপ্ত বায়ুতে দগ্ধপ্রায় হইয়া বৃক্ষছায়াতে আশ্রয় লইয়া সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় আমরা মাদ্রাজ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

কলিকাতা ও বোম্বাইর মত সৌন্দর্য্যশালী না হইলেও ইহা একটি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী সহর। ইহা সমুদ্রকূলে অবস্থিত। জর্জ্জ টাউনটি কালা সহর নামে অভিহিত। ইহাও সমুদ্রের উপকূলে স্থাপিত ; এখানে দেশীয় লোকদেরই বাসভবন। অপরটিতে ইংরাজগণের বাস বলিয়া হোয়াইট টাউন বলিয়া খ্যাত। এটি ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। এখানে ডাকঘর, কলেজ, বন্দর ইত্যাদি আছে। ওয়ালটীয়ারের ন্যায় এখানের জল ততটা স্বচ্ছ বা উপকারী নহে।

মাদ্রাজ সহরে যাদুঘর প্রভৃতি দেখিবার মত। এখানে নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে। বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এবং বহুপ্রকার প্রস্তরমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। ভারতে স্বাধীনকালে যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করা হইত, অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ সে সকল এখানকার অস্ত্রাগারে বিদ্যমান। এখানে কুইনস্ কলেজের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে সমুদ্র কিনারায় একটি বাড়ীতে বিভিন্ন কাঁচের চৌবাচ্চায় নানাপ্রকার বিচিত্র সামুদ্রিক মৎস্য ও সর্প জীবিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। মাদ্রাজের সমুদ্রের কূল বাঁধান বলিয়া উত্তাল তরঙ্গ নাই। তাই সমুদ্রে স্নান অতি আরামপ্রদ। এখানে সাতদিন থাকিবার পর ত্রিপ্লিকেন রওনা হইলাম।

ত্রিপ্লিকেন

ত্রিপ্লিকেন ঃ—ত্রিপ্লিকেন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মন্দির অভিমুখে রওনা হইলাম। এখানে বৈষ্ণবদিগের পার্থসারথির মন্দির

প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথিরূপে কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ভক্তের সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত। যুদ্ধ অবশেষে শত শত বাণাঘাতে ভগবানের কোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত দর্শনে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইয়াছিল। ভক্তের জন্য তাঁহাকে কি না সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহা জীবগণকে দেখাইবার জন্য এস্থানের মন্দির মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগ্রহটির প্রতি অঙ্গে এখনও ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। বিগ্রহটি পঞ্চধাতুনির্ম্মিত, কৃষ্ণকায় ও উচ্চতায় দশ হস্ত পরিমাণ। তাঁহার বাম পার্শ্বে রুক্মিনী, বলরাম ওঅণিরুদ্ধ। দক্ষিণে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রস্তরে বাঁধান।

কায়ারাভানি নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ এই যে, এই পুষ্করিণীতে কোন মৎস্য জীবিত থাকিতে পারে না; কারণ পুরাকালে কোন এক সিদ্ধ যোগীপুরুষ ইহার তীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় একটি মৎস্য জল হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার অঙ্গে পতিত হয়। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে আর কোন মৎস্য ঐ পুষ্করিণীতে জীবিত থাকিতে পারিবে না।

এখানকার পূজার বন্দোবস্ত মন্দ নহে। প্রতি শনিবারে অতি সমারোহে ভোগরাগ হইয়া থাকে। দেবোত্তরের আয়ও প্রচুর। ইহা দ্বারাই পূজাপার্ব্বণাদি নির্ব্বাহ হয়।

ঈশ্বর স্বামীর মন্দির

ঈশ্বর স্বামীর মন্দির ঃ—ত্রিপ্লিকেন হইতে দুই মাইল দক্ষিণে স্মার্ত্তদের দেবতা কপালেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটির চারিদিক কালো প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। উহার মধ্যস্থলে মূলমন্দির স্থাপিত। পুরাকালের মহাপুরুষদিগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে একসময় পার্ব্বতীদেবী এক মধুর মূর্ত্তি ধরিয়া এখানে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শিবভক্ত মহাপুরুষগণের ইতিহাস মন্দিরের উত্তর প্রাঙ্গণে একটি স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে। ইহার আরও নাম আছে। তবে অনেকেই ইহাকে স্বামীর মন্দির বলে। মন্দির এবং প্রাঙ্গণে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। তাহার ভিতরে প্রস্তরনির্ম্মিত সন্ন্যাসীদের মূর্ত্তি, আর ৬৩টি পিতলের নির্ম্মিত শিবউপাসকদিগের মূর্ত্তি আছে। পশ্চিম প্রাঙ্গণে সম্বন্ধরের মূর্ত্তি বিদ্যমান। অদ্যাপি তাঁহার যশোগীতি মাদ্রাজের প্রতি ঘরে ধ্বনিত হইয়াছে।

কথিত আছে তন্ত্রীলয়সমন্বিত পবিত্র বেদধ্বনিতে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া তিনি মন্দিরের ভিতরে একটি গলিত চর্ম্ম কঙ্কালসার মৃত বালিকার জীবন দান করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ শিয়ালি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার মাতা যখন তাঁহাকে পুকুরের পাড়ে রাখিয়া স্নান করিতেন তখন শূন্য হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া তাঁহার মুখবিবরে পতিত হইত। তিনি বাল্যকালেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। তাঁহার হস্তে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত মন্দিরা আছে; ইহা বাজাইয়া কীর্ত্তনে না কি সকলকে আনন্দ দান করিতেন।

এ স্থানেরও মুটে, মজুর ও গাড়োয়ানরা ক্রমাগত ইংরাজিতে কথা বলিতে পারে কিন্তু উচ্চারণের তারতম্যে তাহা বুঝিতে পারা অতি কঠিন। এদেশে তেলেগু অপেক্ষা তামিল ভাষা বেশী প্রচলিত। বাংলা ও বোম্বাইর মত উচ্চশিক্ষিত লোক এখানে অতি বিরল। মানুষ যে মানুষকে এত ঘৃণার চোখে দেখিতে পারে তাহা ধারণার অতীত। এখানে পঞ্চম পারিয়া ও টিয়া নামে কয়েকটি জাতি আছে। উহাদের ছায়া পর্য্যন্ত পুকুরে পড়িলে সে জল অপবিত্র হইয়া যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর হইতে যদি একজন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের ভোজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অন্ন বা খাদ্যদ্রব্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই হেয় প্রথা দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র আছে। মাদ্রাজী ব্রাহ্মণরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের শবদাহ করে না। এবং স্পৃষ্ট জল পান করা পাপ মনে করেন। এখানে বয়স্ক ছেলেদের হাতে বালা, কাণে কুণ্ডল দেখা যায়। পুরুষদের কাছাশূন্য এবং মেয়েদের বিপুল কাছা আঁটা। পুরুষদের মস্তকের পুরোভাগ কেশহীন, পশ্চাতে বেণীর ন্যায় দীর্ঘ কেশপুচ্ছ, পরিধানের কাপড় বেশ মোটা, বহরে তিন হাত ও দৈর্ঘ্যে চারি হাত মাত্র। কেহ কেহ রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করেন। ব্রাহ্মণগণ আচারনিষ্ঠ। সকলেই ত্রিসন্ধ্যা জপ ও পূজা পাঠ করেন। সধবারা স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে বেণী রক্ষা করেন বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করেন কিন্তু বাংলাদেশের বিধবাদের ন্যায় কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় না। এখানে তিনদিন অবস্থান করিয়া কালহস্তী রওনা হইলাম

কালহস্তী

কালহস্তী ঃ—আমরা তিরুপতি ও কালহস্তী দর্শন মানসে রেণীগুণ্ঠ জংসন হইয়া কালহস্তী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে পদব্রজে মন্দিরাভিমুখে ভ্রমন করিলাম। ষ্টেশন হইতে মন্দির এক মাইল। পথে পুণ্য সলিলা স্বর্ণমুখী নদীকে অবিশ্রান্ত কলকল নাদে পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া বহিয়া যাইতে দেখিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। নানাপ্রকার পার্ব্বতীয় বৃক্ষলতার মধ্যে উচ্চে অবস্থিত মন্দিরটির শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে মন্দিরে যাতায়াতের জন্য গোযান ঝটকা পাওয়া যায়। মন্দিরের নিকটে শ্রীপুর মহারাজের প্রাসাদ। শুনিলাম রাজা নবাগত তীর্থযাত্রীদের আবেদন পাইলে আহার ও বাসস্থান দিয়া তাঁহার ছত্রে অতিথি সংকার করিয়া থাকেন। এই কালহস্তীর অপর নাম শ্রীপুর। মন্দিরটি দুইটি পর্ব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভগবান মহাদেব এখানে বায়ুমূর্ত্তিতে বিরাজমান।

এই কাল ও হস্তী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, পাপভ্রষ্ট হইয়া দুই সেবানুচর কাল ও হস্তী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিবভক্ত হইয়া জন্মায়। ইহারা এই পর্ব্বতে থাকিয়া সর্ব্বদা ইষ্টকার্য্যে তৎপর থাকিত। নাগ তাহার আপন শিরস্থ মণি দ্বারা মহাদেবের আরতি করিত আর হস্তী তাহার শুড় দ্বারা জল অভিষেক সম্পন্ন করিত। একদিন হস্তী জল অভিষেক করার সময় সেই জলের কয়েক বিন্দু নাগের গায়ে পতিত

হয়। ইহাতে নাগ ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তীকে দংশন করে। হস্তী বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শুঁড়প্রহারে নাগের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক নিজের প্রাণ ত্যাগ করিল। ভক্তবৎসল উমাপতি ভক্তদ্বয়ের মৃত্যু হইলে অন্তে চরণে স্থান দিয়া তাহাদের মুক্তি দান করিলেন। ভক্তের অকপট সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ নিজমন্দিরের নাম রাখিলেন কালহস্তী এবং এই কাল ও হস্তীর দুইটি মূর্ত্তি মন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ইহা ব্যতীত একটি ঊর্ণনাথের মূর্ত্তিও এখানে আছে। এই মূর্ত্তিই মহামায়ার মহাজাল উদ্যোতক। মূল মন্দিরে মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইহার আকৃতি সাধারণ লিঙ্গের ন্যায় বর্ত্তুলাকার নহে, চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভসদৃশ। একটি প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা অনুক্ষণ লিঙ্গপার্শ্বে প্রজ্জ্বলিত আছে। মন্দিরঅভ্যন্তর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় একটি মাকড়শা বহুকাল হইতে লিঙ্গোপরি সর্ব্বক্ষণ জাল নির্ম্মাণ করিতেছে এখানকার লোকদের অভ্রান্ত বিশ্বাস যে কোন ঋষি ঊর্ণনাভ মূর্ত্তিতে মহাদেবের সেবায় এইভাবে নিযুক্ত। অনাদি লিঙ্গের পাশে জ্ঞানপ্রসন্না নামে এক দেবী মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার পার্শ্বস্থ এক মন্দিরে দুর্গাম্বা মূর্ত্তি আছেন। মুমূর্ষু রোগীকে অন্তিমে মুক্তিলাভের নিমিত্ত এ স্থানে আনয়ন করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, দক্ষিণ কর্ণে তাহাকে তারকব্রহ্ম নাম দেওয়া হইলে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বে দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করে, পরে ঐ স্থান দিয়াই প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। প্রবাদ

আছে যে, মনিশালিয়া গনি নামে জনৈক নারী শিব আরাধনায় প্রাণপাত করেন। ভক্তের কঠোর তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া সেই নারীকে অন্তিম কালে দক্ষিণ কর্ণে এই তারকব্রহ্ম নাম দেন। সেই হইতে এখানে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে।

কপালেশ্বর

কপালেশ্বর ঃ—দুর্গম্বা মন্দিরের দক্ষিণে কপালেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্যাধমতে শিবের পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, উদিপুরে টিনার নামে এক ব্যাধ ছিল। একদিন তাহায় শরে আহত হইয়া একটি বরাহ প্রাণ রক্ষার আশায় গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। ব্যাধবালক টিনার উহার পশ্চাৎধাবন করিয়াও সন্ধান না পাইয়া এই মন্দিরে রাত্রি যাপন করে। পরদিন সকালে গৃহে ফিরিবার সময় মন্দিরস্থিত শিবমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে, এবং আর সংসারে না ফিরিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক শিবের আরাধনা করিতে থাকে। কিন্তু নিজবৃত্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া জীবন ধারণের জন্য মৃগয়ালব্ধ মাংস গোপনে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া আহার করিত। পূজারীগণ মন্দির মধ্যে রক্তমাংসের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য মন্দির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এক দিন দেখিতে পাইল এক বালক নির্ভয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্ত্তির সম্মুখে উপবেশন করতঃ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল এবং ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। মহাভাবে তন্ময় টিনারের

একপার্শ্বে ধনুক ও তূণ, অপর পার্শ্বে ভোগের উপকরণ মৃগয়ালব্ধ মাংস। ইহা দেখিয়া পূজারীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধ্যানান্তে টিনার বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে পূজারীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পূজারীরা তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে অন্তর্যামী ভগবান ভক্তের গৌরব রক্ষার জন্য নিজ অক্ষিপুট হইতে রক্তস্রাবের সহিত অক্ষিগোলক তুলিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া পূজারীরা অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ভক্ত টিনার ইহা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাণের অগ্রভাগ দ্বারা নিজ অক্ষিগোলক উৎপাটন করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের নয়নে সংস্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাদেবের অপর অক্ষিগোলকও বহির্গত হইল। এবারও টিনার নিঃসঙ্কোচে তাহার আর একটি অক্ষিগোলক উৎপাটন করিয়া ইষ্টদেবতার সম্মুখে ধরিল। এবার সে অন্ধ বলিয়া মূর্ত্তির অক্ষিকোটরে তাহা সংস্থাপন করিতে পারিল না। ভক্তবৎসল মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না : স্বীয় অমৃত করস্পর্শে টিনারকে চক্ষুষ্মান করিয়া জগৎকে দেখাইলেন যে তাঁহার নিকট জাতিবৈষম্য নাই ; শব আর নৈবেদ্য উভয়ই তুল্য। পরে তিনি নিজ মূর্ত্তির পার্শ্বে টিনারের মূর্ত্তি স্থাপন করাইলেন। অদ্যাপি অনাদি লিঙ্গ ও টিনারের মূর্ত্তি সেস্থানে ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে।

এই মন্দিরের পাদদেশে ব্রহ্মার মন্দির ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে ব্রহ্মা ও ভরদ্বাজ বহুকাল এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ পূজা

হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি জলাশয়ের নিকট মাঘীপূর্ণিমায় অতি সমারোহের সহিত মহোৎসব এবং শিবরাত্রিতে দশদিন ব্যাপী উৎসব হয়। সেই সময় অষ্টম দিবসে স্থানীয় রাজা হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমভিব্যাহারে মন্দিরে আসেন এবং দেবতার ভোগমূর্ত্তি স্বর্ণ রথোপরি স্থাপনপূর্ব্বক নগর প্রদক্ষিণ করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রথা আছে এবং ঐ সময়ে মিষ্টান্ন ও ঘোল সকলকে বিতরণ করা হয়। এখানে দর্শন শেষ করিয়া "বালাজী" রওনা হইলাম।

তিরুপতি বা বালাজী

তিরুপতি বা বালাজী ঃ—তিরুপতি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সহরে ধর্ম্মশালায় বিশ্রামান্তে রাত্রি প্রায় একটার সময় যাত্রীদের সঙ্গে বালাজী পর্ব্বত অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। স্থানটি পার্ব্বত্য; অদূরে কেবল গিরিশৃঙ্গই দৃষ্টিগোচর হয়। একে কৃষ্ণপক্ষ, তদুপরি গভীর রাত্রি বলিয়া ঘোর অন্ধকার। পার্ব্বত্য পথের উভয় পার্শ্বে সাল, সেগুনের নিবিড় অরণ্য। স্থানে স্থানে বৃক্ষলতার আড়াল হইতে স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে যাত্রীরা পথে অগ্রসর হইতেছিল। অগ্রবর্ত্তী যাত্রীরা নীচের যাত্রীদের পথের সন্ধান দিবার জন্য 'গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া চলিয়াছে। এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার চারিটি সহজ পথ। অপর কয়েকটি পথ দুর্গম; আমরা সেই দুর্গম পথ ধরিয়াই পর্ব্বত শিখরে উপনীত হইলাম।

তিরুপতি নগর চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত। এখানে

যাত্রীদের থাকিবার ছত্রম্ ও হোটেল আছে এবং পাণ্ডাদের কোন উপদ্রব নাই। তিরুপৎ পর্ব্বতটি পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার একটি অংশ মাত্র। সত্যযুগ হইতে এই ভূধরটি হিন্দুদের একটি বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বেঙ্কটেশ্বর মাহাত্ম্যে আছে যে, পুরাকালে কোন এক সময় ভগবান বিষ্ণু কমলার সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতেছিলেন এবং শেষনাগ দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় বায়ু মুর্ত্তিমান হইয়া বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নাগকে উপেক্ষা করিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে নাগ বাধা দেয়, কিন্তু বায়ু বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কালে উভয়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে পরস্পর শক্তি পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নাগ মরুৎ পর্ব্বতের সহস্র শৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাকেন। বায়ু ঘন ঘন ঝঞ্ঝাবাতে নাগবেষ্টিত গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরস্ত হইলেন। নাগ বায়ুকে পরাস্ত হইতে দেখিয়া রণে বিজয়ী জ্ঞানে সগর্ব্বে সহস্র ফণা বিস্তার করেন। এই সুযোগে পরাক্রান্ত বায়ু নাগকে গিরিশৃঙ্গ সহ অর্দ্ধলক্ষ যোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তাহার একটি শৃঙ্গ ভেঙ্কটগিরি বা তিরুপতিতে আসিয়া পড়িয়াছিল।

এই তিরুপতির প্রধান বিগ্রহ বরাহ অবতার বিষ্ণুমূর্ত্তি মন্দিরটি পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত। যখন ভক্ত শ্রীনিবাস এখানে আসেন তখন গোলোকপতি ভগবান আবির্ভূত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি এখানে পূজা চলিয়া আসিতেছে।

প্রবাদ যে, সৃষ্টির প্রারম্ভেই এই পর্ব্বত এখানে পতিত হইয়াছিল। বিভিন্ন যুগে দেবতাদের প্রধান লীলাভিনয়ের স্মরণার্থে আর্য্যেরা যুগে যুগে মহীধরের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন ; যথা ঃ—সত্যযুগে বৃষভহারী, ত্রেতায় অঞ্জনাচল, দ্বাপরে শেষাচল, কলিতে ভেদগিরি নামে খ্যাত। এই দেশবাসী ভেদগিরিকে অনন্তনাগের পাষাণমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। দূর হইতে মনে হয় যেন কোন মহাযোগী সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইয়া একমনে ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছেন। গিরির সাতটি শৃঙ্গ আছে। ইহাকে নাগবরের সপ্তশির বলা হয়। উর্দ্ধে ভেঙ্কটাচলপতি, মধ্যস্থলে অহবালায় আর শেষভাগে শ্রীশৈলম্ বা মল্লিকার্জ্জুন।

নাগদেবের কুণ্ডলীরেখা আজও বর্ত্তমান। নাগ এখানকার আদিমূর্ত্তি। রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এখানে আসিয়া স্বামীতীর্থ করিয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবগণ বনবাসকালে এক বৎসর এই পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। তাহার নাম পাণ্ডবতীর্থ হইয়াছে। পর্ব্বতের নানাস্থানে ঝর্ণা ও জলাশয় আছে। সবগুলিই তীর্থ বলিয়া গণ্য ; যথা—স্বামীতীর্থ, বিরদগঙ্গা, পাপনাশিনী, পাণ্ডবতীর্থ, তুম্বিরকোনা, কুমারবারিকা, পাহাড়ের সাতটি শৃঙ্গও তীর্থ বলিয়া গণ্য। শেষ শৃঙ্গেই শ্রীভেঙ্কটস্বামীর মন্দির অবস্থিত। এখানের বিশাল শৈল-মালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অন্তর যেন এক নবভাবে ভরিয়া উঠে।

পর্ব্বতের নিম্নে অনেকগুলি মন্দির আছে। এইসব মন্দিরে গোবিন্দ পেরুমল ও ভেঙ্কটাচল পতির বিরুদ্ধভাব

মূর্ত্তি স্থাপিত এই মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী একটি গম্বুজ আছে। এতদ্ব্যতীত একটি মন্দির মধ্যে ষোড়শ হস্তে অস্ত্রধারী এক মূর্ত্তি আছে, নাম সুদর্শন অগ্নি বা সংহার অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহার নিকট হইতে সুদর্শন চক্র গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণু ভক্তগণকে রক্ষার্থে এই মূর্ত্তিতে ষোড়শ হস্তে ষোড়শ প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। শত্রু আক্রমণকালে এই মূর্ত্তিকে পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইলে সপ্তশিখা প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুকে গ্রাস করে। স্থানটি নির্জ্জন, বৃক্ষলতাকুঞ্জে আবৃত। সুশীতল বায়ু, নিবিড় ছায়া ও অজস্র জলপ্রপাত আপনা হইতেই যেন মনকে শান্ত করে। এখানকার দেবসম্পত্তির আয় বাৎসরিক প্রায় সাত লক্ষ টাকা। এদেশীয় রাজা ও জমিদাররাও দেবভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করে। বিগ্রহ দর্শনী ও তুলসী চন্দনাদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে মোহান্তের নিকট তেরো টাকা জমা দিতে হয়। ইহাতে দর্শনের কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। বেলা আড়াইটার পর যাত্রীরা বিনা দর্শনীতে দেব দর্শন করিতে পারে। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও প্রসাদ বিক্রয় হয় এবং প্রসাদে কোন জাতিভেদ নাই। যাত্রীদের জন্য অনেকগুলি ছত্রম আছে। এখানে দর্শনীয় বহু বিষয় আছে কিন্তু সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখান হইতে আমরা পক্ষীতীর্থ যাত্রা করিলাম।

পক্ষীতীর্থ বা ত্রিকুনতলাকুণ্ডলম্

পক্ষীতীর্থ বা ত্রিকুন্তলাকুণ্ডলম্ঃ—পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুর যাইতে হইলে চিঙ্গলপৎ ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়।

চিঙ্গলপৎ ছোট সহর এবং চিঙ্গলপৎ তালুকের প্রধান নগর। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। এই প্রদেশের স্বাধীনতার শেষ চিহ্নস্বরূপ তুর্গটি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। চিঙ্গলপৎ হইতে আমরা ত্রিকুন্তলাকুণ্ডলমে পৌঁছিলাম। পাণ্ডাকে ভোগের জন্য টাকা দেওয়া হইলে তিনি আমাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিলেন। মনে ভরসা ছিল যে, সীমাচলের ১২০০ সিঁড়ি যখন আরোহণ করিতে পারা গিয়াছে তখন এখানকার ৫৩৮ সিঁড়ি অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না; কিন্তু নিকটে যাইয়া দেখা গেল যে, সিঁড়িগুলির ধাপ সোজাভাবে উঠিয়াছে। ইহাতে সকলেরই কিছুক্ষণ হতাশভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। পরে সাহসে ভর করিয়া সকলেই সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এই পাহাড়টি অতিক্রম করিয়া কয়েকটি সোপান, তাহার পর প্রবেশদ্বার ও প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তুইদিকে পাহাড়, একদিকে প্রাচীর ও অপর দিকে কয়েকখানি পাথরের ঘর। আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশকরামাত্র পর্ব্বতশিখর হইতে এক মধুর বাদ্যধ্বনি শুনিলাম। সানাইর সুমধুর সুরে মুগ্ধ হইয়া উক্ত খাড়াই সিঁড়ির অতিক্রম জনিত ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। ইহার পর আমরা বেদগিরীশ্বরের মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলাম।

পর্ব্বতশিখরে বেদগিরীশ্বরের মন্দির প্রস্তরবেষ্টিত ও আকারে তুর্গের ন্যায়। প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত দ্বার অতিক্রম করিয়া মূল মন্দির মধ্যে বেদগিরীশ্বর মহাদেব দর্শন করিলাম। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পূজার উপকরণ পাণ্ডার হাতে

দিয়া কর্পূরআরতি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম্। আরতির আলোকে বিগ্রহ স্পষ্টভাব দেখা গেল—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি, লিঙ্গোপরি ধাতু নির্ম্মিত ভীমকায় ফণি চক্র ধরিয়া আছে।

মূলমন্দির প্রদক্ষিণের সময় দেখিলাম হরপার্ব্বতীর মাঝখানে গণেশ মূর্ত্তি শোভিত। দক্ষিণ প্রাচীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও তাহার নীচে মার্কণ্ডেয় ঋষির মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের বহির্গাত্রে যোগিনী ও দক্ষিণা মূর্ত্তি খোদিত আছে।

এ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, দেবাদিদেব মহাদেব কোন সময় এখানে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার পরম ভক্ত নন্দী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সেই সময় বিষ্ণুবাহন গরুড় প্রভুর আজ্ঞায় মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বিষ্ণুর আজ্ঞা নন্দীকে জানান সত্ত্বেও সে গরুড়কে সাক্ষাৎ করিতে দিতে অসম্মত হইল। অগত্যা গরুড় আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চ স্বরে মহাদেবকে ডাকিতে থাকেন। ইহা শ্রবণে মহাদেব বাহিরে আসিয়া গরুড়ের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া নন্দীকে অভিসম্পাত করিলেন। ফলে নন্দীকে বহুকাল এস্থানে তপস্যা করিয়া শাপমুক্ত হইতে হয়। আরও প্রবাদ যে, বেদ মূর্ত্তিমান হইয়া এখানে শিবের উপাসনা করিয়াছিলেন। তদবধি এ স্থানের নাম হয় বেদগিরি। স্বর্গপতি দেবরাজও নাকি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধার্থে এখানে শিবের তপস্যা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এখনও তিনি প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর একবার লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে পদার্পণ করেন ও সেই সময় ঘন ঘন বজ্রধ্বনিতে তাঁহার পবিত্র আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হয়।

ইহার পর আমরা অন্য এক পাণ্ডার সহিত পক্ষীতীর্থ দেখিতে চলিলাম। একটি সমতল পর্ব্বতউপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে একটি বেদীযুক্ত চালাঘরের নিকট বসিয়া পাণ্ডারা যাত্রীগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহার পর দক্ষিণ দিকে একটি গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। আমরা দর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডারা ভোগের পাত্র ও পূজার উপকরণাদি লইয়া ঐ গিরির উপরে উঠিলেন। পাণ্ডাকে দেখিবা মাত্র অজ্ঞাত স্থান হইতে একটি শ্বেতকায় পক্ষী পর্ব্বতোপরি আসিয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরেই আর একটি ঐরূপ পক্ষী দূর হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ স্থানে আসিয়া বসিল। পাণ্ডাজী আড়ম্বরের সহিত একখানি কাষ্ঠ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারপর পক্ষীদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্তবস্তুতি দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলেন। পক্ষীদ্বয় নিকটে আসিলে পাণ্ডা দুইটি ঘৃতপূর্ণ বাটী উহাদের সম্মুখে রাখিলেন। উহারাও নির্ভয়ে ঐ ঘৃত পান করিল। ইহার পর পাণ্ডা ঘৃতপক্ক অন্ন সম্মুখে রাখিলে উহারা তাহাও ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভোজনান্তে সামান্য সময় স্থিরভাবে চারিদিকে যাত্রীদের প্রতি তাকাইয়া আকাশপথে উড়িয়া দিকচক্রবালে মিলাইয়া গেল। পাণ্ডারা বলিলেন—এইবার পক্ষীদ্বয় রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাত্রা করিল।

কথিত আছে, দুইজন যোগীপুরুষ ভগবানের সমীপে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য পক্ষীদেহ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বজন্মের

সুকৃতির ফলে জ্ঞান ও স্মৃতি উহাদিগকে ঘৃণিত আহার হইতে বিরত রাখিয়াছে। শুধু অভিশাপ ভোগের নিমিত্ত এই পক্ষীদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে এবং পাপক্ষয় করিবার জন্য প্রত্যহ বেদগিরির দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে। বেদগিরি হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তবৎসলেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

এই মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার চারিটি বড় এবং আটটি ছোট গোপুর আছে। ইহার পর প্রাঙ্গণ ও তারপর বৃহৎ মণ্ডপ। মণ্ডপের স্তম্ভগুলির গাত্রে শিল্পকার্য্য ও খোদিত মূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। জনয় নামক একটি প্রস্তর বাঁধান পুষ্করিণীর নিকট আসা হইল। ইহার তীরে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতে হয়। এখানে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পিণ্ডদান করা মাত্রই একটি শ্বেত শকুনি তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এখান হইতে আরও কয়েকটি মন্দির দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। ইহার পর মহাবলীপুরম্ অভিমুখে রওনা হইলাম।

মহাবলীপুরম্

মহাবলীপুরম্ ঃ—চিঙ্গলপৎ হইয়া মহাবলীপুরম্ আসিয়া পৌঁছিলাম। কয়েকটি ছোট মাঠ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের কীর্ত্তি দেখিবার জন্য মহাবলীপুর প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে এখানে সাতটি মন্দির সমুদ্রতটে পাশাপাশিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, মন্দিরের ভিত্তি হইতে

চূড়া পর্য্যন্ত সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। ইহার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া এক মনোহর জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিত। সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য দেখিয়া বঙ্গোপসাগরের নাবিকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইত। এ স্থানে প্রবল পরাক্রান্ত অসুররাজ বলি এই নগর নির্ম্মাণ করেন। বলিরাজের পাতাল প্রবেশের পর তাহার পুত্র সহস্রবাহু বাণাসুর এই নগরের অধীশ্বর হন। বাণাসুরের এক অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যা ছিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ তাহাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রচ্ছন্নভাবে নগরে উপস্থিত হন। বাণাসুর এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কন্যা রাক্ষর নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অনিরুদ্ধ পরাস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণ এ সংবাদ জানিতে পারিয়া পৌত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত সত্বর আসিয়া নগর অবরোধ করেন। বাণাসুর শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া এই মহাযুদ্ধে তাহার উপাস্য দেবতা আশুতোষকে স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভক্তের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ফলে হরিহরে যুদ্ধ বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ চক্রবাণে অসুরের দুইটি হাত পূজার জন্য রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ছেদন করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অসুর সমানভাবে হরিহরের উপাসনায় রত হইলেন।

ইহার বহুকাল পরে এই বংশে মালতি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাগ্যক্রমে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন পান ও তাহার নিকট নতশিরে স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার জন্য

প্রার্থনা করেন। মহাপুরুষ রাজার প্রার্থনায় তাহাকে দিব্য চক্ষুদানে স্বর্গরাজ্য দর্শন করাইলেন। অসুররাজ স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা ও ব্রহ্মার চিত্তবিমোহনকারী কলাকৌশল নিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের অনুকরণে মহাবলীপুরম্ নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। এককালে এই নগর স্বর্গীয় শোভামণ্ডিত ছিল। সেইসকল কীর্ত্তিকলাপ ভগ্ন অবস্থায় এখনও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। আরও প্রবাদ—পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বনবাসকালে তাঁহারা সপরিবারে বলিরাজার এই রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন। এই সকল স্মৃতি-চিহ্ন দর্শন করিয়া এক অপার্থিব আনন্দে অন্তর ভরিয়া উঠিল।

এ স্থানের এক পর্ব্বতগাত্রের বহির্ভাগে বহু জীবজন্তু ও দেবদেবীর খোদিত মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া শিব ও ইন্দ্রের নিকট যে পাশুপত অস্ত্র পাইয়াছিলেন তাহার চিত্রসকল এই পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত আছে। একস্থানে সমাহিতচিত্ত অর্জ্জুন একপদে ভর করিয়া ধ্যানমগ্ন আছেন, অর্জ্জুন কঠোর তপস্যায় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, দেবগণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছেন। আশুতোষ পাশুপত অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান। এরূপ বহু দর্শনীয় বস্তু আছে। এ স্থানের দর্শনীয় বিষয় শেষ করিয়া আমরা কাঞ্চীভরম্ যাত্রা করিলাম।

কাঞ্চীভরম্

কাঞ্চীভরম্ ঃ—আমরা কাঞ্চীভরম্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ভারতের সাতটি মহাতীর্থ যথা—কাশী, কাঞ্চী, অযোধ্যা,

বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার এবং অবন্তিকা। কাঞ্চীভরম্ উক্ত সাতটির মধ্যে একটি। উক্ত মহাতীর্থের মধ্যে তিনটি শৈবদিগের আর তিনটিতে বিষ্ণুউপাসকদের প্রাধান্য। কেবলমাত্র কাঞ্চীভরমেই দুইটি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সমান। এই স্থানটিকে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলা হয়। এই নগরী মাদ্রাজের ৪৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার একটি আদর্শ স্থান। শৈব, বিষ্ণু, বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের উপাসকগণ এখানে পরস্পর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদের রুচিঅনুযায়ী নগরটিকে গঠন করে। তাহাদের সেই সকল কীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ আজও অনেক মন্দির, স্তম্ভ ও প্রস্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। এককালে এখানে ১০৮ শিবমন্দির ও ১০৮ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের প্রভাবে উহার অধিকাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। রাস্তাগুলি সরল ও প্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে নারিকেল বৃক্ষ শোভিত। আমরা এখানে ছত্রমে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

সহরটি দেখিলে মনে হয় বেশ পুরাতন এবং এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কাঞ্চীভরম্ দুইভাগে বিভক্ত—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। ষ্টেশন হইতে শিবকাঞ্চী এক মাইল এবং শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী তিন মাইল ব্যবধান। প্রথমে আমরা শিবকাঞ্চী বিগ্রহ দর্শন মানসে গমন করিলাম। এখানকার দেব বিগ্রহের নাম একাম্রনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি। দেবীর

নাম কামাখ্যা দেবী। এ স্থানের নহবৎখানায় দাঁড়াইয়া গোপুরমের শিল্পকলাদি দেখিতে লাগিলাম। দক্ষিণ প্রদেশে মন্দির অপেক্ষা গোপুরগুলি অনেক উচ্চ এবং নিম্ন হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে শোভিত। এ দিকের প্রায় সকল মন্দিরই দুর্গের ন্যায় উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ও দুর্ভেদ্য। শিবকাঞ্চীর মন্দির প্রায় ৭৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এবং প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রবেশ তোরণ আছে। ইহার প্রত্যেকটি নানাপ্রকার শিল্পমণ্ডিত। মন্দির সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ধ্বজস্তম্ভ। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দিরের বামদিকের উঠানের কোণে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভযুক্ত উৎসব মণ্ডপ। মন্দিরের প্রাঙ্গণে গণপতি ও দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের মন্দির। ইহার পার্শ্বে বৃষে উপবিষ্টা পার্ব্বতী। অনেকগুলি স্তম্ভ গাত্রে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ তামিল ও সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আছে।

শিবকাঞ্চীর মন্দিরের মধ্যে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরই অন্যতম। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত প্রবেশের তিনটি দ্বার আছে। উহার নিকট দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। তাহার উপর দুইটি নারী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এই স্তম্ভের পাশেই পাপনাশিনী নামে একটি সরোবর অবস্থিত। এই নারী মূর্ত্তি দুইটি সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে কোন কালে ইহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এ স্থানে আশ্রয় লয়। কামাখ্যা দেবীর কৃপায় পাপনাশিনী সরোবরে স্নান করিয়া তাহারা মুক্তি পায়। অতঃপর

তাহাদের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। কামাখ্যা দেবীর বাহন সিংহমূর্ত্তি পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখে একটি ধ্বজস্তম্ভের নিম্নভাগে অবস্থিত। দেবী ত্রিনয়নী তাঁহার ভ্রূমধ্যস্থ চক্ষু অগ্নি, দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্য ও বাম চক্ষু চন্দ্রসম। আচার্য্য শঙ্কর যখন কাঞ্চী নগরীতে আসেন তখন দেবীর লোলজিহ্বা নরশোণিত ব্যতীত পরিতুষ্ট হইত না। আচার্য্য দেবীকে উপাসন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রক্তের প্রবাহ কতকটা বন্ধ করেন এবং পরে দেবীকে ধীরে ধীরে সেই পীঠস্থানে সাম্য মাতৃমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া তোলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি সাধারণতঃ পীঠ বা বেদীর উপর স্থাপিত হয় কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত। পীঠ বা বেদী দেবীর পদতলে স্থাপিত। দেবীর সম্মুখে পৃথকভাবে একটি চক্র প্রোথিত। শঙ্করাচার্য্য যোগবলে ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া চক্রটিকে চতুষ্কোণ আকৃতি করিয়াছিলেন।

স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা পার্ব্বতী ক্রিয়াছলে পশ্চাৎ দিক হইতে হস্তদ্বারা মহাদেবের ত্রিনয়ন আবৃত করেন। ইহাতে সৃষ্টির বৈষম্য উপস্থিত হইল। মহাদেব কুপিত হইয়া পার্ব্বতীকে অভিশাপ দেন এবং এই অপরাধ ভক্তগণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া কাঞ্চীপুরমের নিকটস্থ কাবেরী তীরে ছয়মাস তপস্যার জন্য আদেশ করেন। ছয়মাস পর দেবীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দর্শন দিয়া দেবীকে গ্রহণ করেন। ইহাই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস। এখানে দেবীর পূজা ও পুষ্পাভিষেক নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে।

এই মন্দির প্রাঙ্গণস্থ সরোবরের উত্তর পূর্ব্বদিকে একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। ইহার অপর পার্শ্বস্থ মন্দিরে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার প্রাঙ্গণে আচার্য্য শঙ্করের সমাধি গৃহ। এই গৃহের ছাতের উপর একটি গেরুয়া রঙের পতাকা অদ্যাবধি বৈরাগ্যের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। সমাধির উপর তাঁহার একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং উহার পার্শ্বে তাঁহার ছয়টি শিষ্যের মূর্ত্তি দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান। এখানে নিত্য পূজা ও আরতি হইয়া থাকে।

এই সমাধিমন্দির অতিক্রম করিয়া একাম্রনাথের মন্দিরে যাইতে হয়। প্রথমে একটি প্রকোষ্ঠ। ১৬টি ভাস্কর খোদিত সুন্দর স্তম্ভের উপর ছাত অবস্থিত। আমরা মন্দিরের দ্বারে থাকিয়া একাম্রনাথ দর্শন করিলাম। এই শিবলিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের পঞ্চভৌতিক লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম ক্ষিতিমূর্ত্তি। লিঙ্গটি মৃত্তিকায় নির্ম্মিত বলিয়া এখানে জল অভিষেক এবং পুষ্পপত্রাদি দেবগাত্রে অর্পিত হয় না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমূর্ত্তির মধ্যে দক্ষিণ ভারতে তিরুবাল্লমলায় তেজমূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ুমূর্ত্তি, চিদাম্বরমে ব্যোমমূর্ত্তি বিদ্যমান। বেদমন্ত্র, স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক পুষ্পাদি বেদীর নীচে অর্পণ করা হয়। কর্পূরারতি দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরেই প্রচলিত আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পর জৈনধর্ম্ম এ স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শঙ্করাচার্য্য শৈব ও রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক এস্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত করেন। কথিত আছে,

কাঞ্চী কাশী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কাশীতে কেবল স্থান মাহাত্ম কিন্তু কাঞ্চী জ্ঞানে, যোগে ও বিদ্যায় সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এ স্থান দর্শনে বহু পাপ নাশ হয় ও মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়।

কৈলাসনাথের মন্দিরে হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত। বিগ্রহটি অর্দ্ধনারীশ্বর—অর্থাৎ তাহার অর্দ্ধাঙ্গ নারী ও অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ। হস্তে বীণা যন্ত্র, শিব বৃষোপরি উপবিষ্ট। দক্ষিণ ভারতে এরূপ বিগ্রহ আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার অনতিদূরে ৪।৫টি মন্দির অবস্থিত। একটিতে পঞ্চধাতু নির্ম্মিত চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি আছে। তাহার একহস্তে তালপত্রের দপ্তর, অপরহস্তে লোহার সিঁড়ি। কথিত আছে যে জীব তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে উক্ত সিঁড়ির এক একটি ধাপ প্রাপ্ত হয়। জন্মগ্রহণের পর হইতেই ক্রমে তাহাদের উত্থান পতন আরম্ভ হয়। এবং সেই সঙ্গে দপ্তরে সমস্ত বিষয় অঙ্কিত হয়। মৃত্যুর পর জীব বিচারার্থে ধর্ম্মরাজের সমীপে আনীত হইলে তখন চিত্রগুপ্তের দপ্তর হইতে সমস্ত কর্ম্মফল ও সাক্ষীস্বরূপ এই সিঁড়ি বিচার গৃহে প্রদর্শিত হয়। এই বিগ্রহটি দেখিলে যেন স্বভাবতঃ মনে ভয়ের উদ্রেক হয়।

শিবকাঞ্চীর একটি বিশেষ ঘটনা

শিবকাঞ্চীর একটি বিশেষ ঘটনা ঃ—এই শিবকাঞ্চীতে পাতাল গঙ্গা নামে বৃহৎ একটি সরোবর আছে। ইহার জলের বর্ণ কালো মেঘের ন্যায় এবং সর্ব্বদাই তরঙ্গ খেলে। সরোবরের মধ্যস্থলে উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট একটি মন্দির অবস্থিত। পুরাকালে

কোন রাজা সরোবরের তলদেশ হইতে এই মন্দিরের ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহাতে কেহ সাঁতার কাটিয়া মন্দিরে প্রবেশ না করে এ জন্য সরোবরের চতুর্দ্দিকে পুলিশ পাহারায় রত। জানা গেল যে, ঐ মন্দিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক পালোয়ানও জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সেজন্য সরকার হইতে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। এ সকল শুনিয়া বুঝিলাম যে সেখানে যাওয়ায় কোন বিপদ আছে; কিন্তু আমাদের বিগ্রহ দর্শনের আকাঙ্খা প্রবল হওযায় পুলিশকে এ বিষয় জানাইলাম। প্রথমে তাহারা কিছুতেই রাজী হইল না। পরে যখন আমাদের জীবন বিপন্ন হইলে পুলিশ দায়ী হইবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দিলাম তখন তাহারা অনুমতি দিল।

অনুমতি পাইয়া আমরা সাঁতার কাটিয়া মন্দিরের নিকটস্থ হইলাম এবং অনুভব করিলাম, কে যেন জলের ভিতর হইতে সর্ব্ব শরীরকে একটা সূক্ষ্ম জালে জড়াইয়া তলদেশে টানিয়া লইতেছে। ক্রমশঃ কঠিন বাঁধনে অনড় হইয়া পড়িলাম। নিরুপায় হইয়া তখন শরীরকে স্থির করিয়া ভাসাইয়া রাখিলাম। ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন জড়ান ভাবটা ছাড়িয়া গেল। তখন ইহার রহস্য বুঝিয়া অতি সাবধানে ভাসিতে ভাসিতে মন্দিরের বারান্দায় যাইয়া উঠিলাম। এর পর ইঙ্গিতে সঙ্গীদের মন্দিরে আসিবার উপায় বুঝাইয়া দিলাম। তাহারা সেইভাবেই আসিয়া পৌঁছিল। মন্দিরের গভীরতম অভ্যন্তরে কি বিগ্রহ আছে তাহা দেখিবার জন্য

প্রথমে আমি একাই উপর হইতে নিম্নদিকে সরু সিড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণে অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলাম। নীচে পৌছিয়া যেমন সূচীভেদ্য অন্ধকার তেমনি বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা অনুভব করিলাম। জলের উপর হইতে মন্দিরের তলদেশ প্রায় ৩০।৪০ হাত গভীর হইবে। অন্ধকারের জন্য সেখানে কি আছে তাহা দেখিবার উপায় নাই। অনুমানে হাতের স্পর্শে বুঝিলাম বিগ্রহ শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি। তাই সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলের জল নিংড়াইয়া লিঙ্গোপরি অর্পণ করিলাম। জল লিঙ্গে অর্পিত হইবামাত্র ভীষণ একটা গর্জ্জন হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকার ফলে আবছায়া দেখিতে পাইলাম সেই লিঙ্গের উপর এক মস্ত বড় বিষধর অজগর। ইহার চোখ অন্ধকারে তারার ন্যায় জ্বল জ্বল করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহার নিকটে থাকা বা সরিয়া যাওয়া উভয়ই বিপদজনক। তাই মনসাদেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া পিছন দিকে পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কয়েক ধাপ উঠিবার পর দেখা গেল অজগর তখন পর্য্যন্তও আক্রমণের কোনপ্রকার চেষ্টা করিল না। তাই কিছুটা ভরসা পাইয়া স্বাভাবিক ভাবেই উপরে উঠিলাম। সঙ্গীরা ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর না দিয়া তাহাদের লইয়া সরোবরের বিপদজনক স্থানটি অতি সতর্কতার সহিত অতিক্রম করিয়া তীরে আসিয়া পৌছিলাম।

তীরস্থ জনতা আমাদের ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত

আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং অন্ধবিশ্বাসে আমাদের মস্তকে ফুল ছড়াইতে লাগিল। ইহাতে আমরা লজ্জিত হইয়া সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এখান হইতে আমরা বিষ্ণুকাঞ্চী রওণা হইলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চী ঃ—

বিষ্ণুকাঞ্চী ঃ—শিবকাঞ্চী অপেক্ষা বিষ্ণুকাঞ্চী অধিকতর শ্রীসম্পন্ন। রাস্তার উভয়পার্শ্বে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান এবং তৎসংলগ্ন ছোট ছোট উদ্যানবেষ্টিত বাসভবন ও দেবমন্দির। সে সময়টা গ্রীষ্মকাল ছিল। দেখা গেল, প্রত্যেক দেবমন্দিরে দেবতার ভোগে দধি, আদার টুক্‌রা ও লবণ মিশ্রিত অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। দর্শনার্থীদের সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলাম। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, মন্দির শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত। একটি বৃহৎ কারুকার্য্যময় গোপুর অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণ পার্শ্বে শতহস্তবিস্তৃত মণ্ডপ, তদুপরি প্রস্তর-কূর্ম্ম, কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশে একখানি পদ্মাসন। উৎসবের সময় ভোগমূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এই আসনে স্থাপন পূর্ব্বক নৃত্য গীতবাদ্য হয়।

মন্দির দ্বারে নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার পর সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম, একখানি প্রকাণ্ড ঘর, তাহার ভিতর অনেকগুলি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিতেছে এবং দেওয়ালে ধর্ম্ম বিষয়ক নানা চিত্র অঙ্কিত আছে। ক্রমে

আমরা বরদারাজস্বামীর বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মূলমন্দিরে উঠিবার পাঁচটি সিড়ি রৌপ্য মণ্ডিত। মূল মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। আমরা নিকটস্থ হইয়া দেবদর্শন করিলাম। বিগ্রহ বিষ্ণুমূর্ত্তি; তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত, সৌম্য ও সুন্দর এবং বহুবিধ মণিমুক্তা, স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। মস্তকের রত্নময় কিরীটে আরতির দীপালোক পতিত হওয়ায় হীরকগুলি তারকারাজির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছিল।

এই মন্দির সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে—এক সময় ব্রহ্মার সহিত দেবী সরস্বতীর মনোমালিন্য হয়। দেবী অভিমানে ব্রহ্মার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন। ব্রহ্মা ইহাতে কুপিত হইয়া বলিলেন—এরূপ গর্ব্বিতা ভার্য্যা অপেক্ষা বিষ্ণুর লক্ষ্মী অনেকাংশে শ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মীদেবীর প্রশংসায় সরস্বতীর ক্রোধাগ্নি আরও প্রজ্বলিত হইল ও তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অগত্যা ব্রহ্মা বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ব্রহ্মা যজ্ঞে যখন পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে প্রস্তুত তখন সরস্বতী যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য নদীরূপে তথায় প্রবাহিতা হইলেন। ব্রহ্মা নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে রক্ষার নিমিত্ত উলঙ্গ হইয়া নদীর গতিমুখে শয়ন করিলেন। ইহাতে লজ্জিতা হইয়া সরস্বতী বিরত হইলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন—আজ হইতে দক্ষিণ ভারতে ভাগীরথী অপেক্ষাও সরস্বতী পুণ্যসলিলা বলিয়া গণ্য হইবেন। সমবেত ঋষি ও দেবগণের ঐকান্তিক

আগ্রহে কাঞ্চীনগরীতে বিষ্ণু মন্দির ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। বিষ্ণুমন্দিরের নামানুসারে এ স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী হইয়াছে। সহরের মধ্যে রবি, সোম আদি সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে এ সকল তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। এস্থান হইতে আমরা কুম্ভকোনাম যাত্রা করিলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চীর বিশেষ একটি ঘটনা

বিষ্ণুকাঞ্চী যাওয়ার রাস্তার দুই পার্শ্বে যেসকল দেবমন্দির আছে সেখানকার পূজারীরা বৈকালে যাত্রীদের ডাকিয়া দধিমাখা অন্নপ্রসাদ বিতরণ করেন। আমরাও এরূপ অনেক মন্দির হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সঙ্গীরা তাহা ভোজন করে নাই। কিন্তু আমি যে যাহা দিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। তাই ক্রমে তাহা জমা হইয়া একটি বড় বোঝা হইয়াছিল। আমি উহা মাথায় লইয়া চলিয়াছিলাম। পথে অনেক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে এই প্রসাদ বিতরণ করাতেও বোঝা কমে নাই কারণ বিতরণের পরেও অনেক জায়গায় প্রসাদ পাইয়াছিলাম। দধিমাখা অন্ন কাপড়ে বাঁধিয়া মাথায় লওয়াতে দধি গড়াইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে পড়ায় আমাকে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ইহাতে আমার সঙ্গীরা হাসিয়াই আকুল, আর পথচারীরা অবাক হইয়া আমাকে দেখিতেছিল। যাহা হউক, ঐ সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। তখন মন্দিরে আরতি হইতেছিল। তাহা দর্শন করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। এই মন্দির হইতে

ধর্ম্মশালা অনেকটা দূর। অন্ধকার রাত্রি, সঙ্গে আলো নাই, অচেনা পথ, আবার একটি ছোট নদীও সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, কারণ রাত্রে নৌকা পাওয়া যায় না, মহারাজও পূর্ব্বেই ধর্ম্মশালায় চলিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় ভগবানকে স্মরণ করিয়া আমরা চারিজন ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং পথে নদী পার হইয়া ধর্ম্মশালা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। এত অসুবিধার মধ্যেও সেই অন্নপ্রসাদের বোঝাটি ত্যাগ করা হয় নাই। ধর্ম্মশালায় আসিয়া দেখিলাম, মহারাজ দুইজন সাধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। আমাদের এতরাত্রে এভাবে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সাধু দুইটি দুইদিন হইতে অনাহারী। তাঁহারা ঐ অন্নপ্রসাদ আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। ইহাতে আমার ঐ প্রসাদ মাথায় বহন করিয়া আনার সার্থকতা অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইলাম।

কুম্ভকোনাম্

কুম্ভকোনাম্ :—আমরা প্রাতে কুম্ভকোনাম্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনটি বেশ বড়, যাতায়াতের যানবাহন যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা ঝট্‌কাযোগে সহরে যাইয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। কুম্ভকোনাম্ তাঞ্জোর জেলার প্রধান সহর। এখানকার রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। স্বচ্ছসলিলা কাবেরী বক্রভাবে সহরটির উত্তর প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ও

দক্ষিণে আলসার নদী বর্ত্তমান। এক সময় এই সহরটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। এ কারণ অত্যাপি কাবেরীতীরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি বৃহৎ কলেজ আছে। সহর মধ্যে ছত্রম্, ধর্ম্মশালা ও অনেক হোটেল আছে। প্রতি মন্দিরে দেবতার প্রসাদ বিনামূল্যে ব্রাহ্মণদের বিতরণ করা হয়। এখানে শঙ্করাচার্য্যের একটি শাখা মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাবেরীতীরস্থ ঘাটগুলি কাশীর ন্যায় পাশাপাশি ভাবে শোভা বর্দ্ধন করিয়া আছে। দেবমন্দিরগুলি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

কুম্ভকোনাম্ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, মহাপ্রলয়কালে পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল তখন একটি মৃন্ময় কুম্ভ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া এ স্থানে সংলগ্ন হইলে উহার কানাটি মাত্র জলের উপরে দৃষ্ট হয়। প্রলয়ান্তে কুম্ভ ঐ স্থানে ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার উপর ব্যাধরূপী হরপার্ব্বতী আসিয়া লিঙ্গ স্থাপন করেন। আমরা কুম্ভেশ্বরস্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মূলমন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দিরবারান্দায় উপস্থিত হইলাম। বিগ্রহটি শিবলিঙ্গ এবং পীঠটি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত। পূজার উপকরণ পাণ্ডার হাতে দিয়া আমরা শার্ঙ্গপাণি মন্দিরে গমন করিলাম। শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরটি বৃহৎ ও ইহার গোপুরম্ দ্রাবিড় দেশীয় শিল্পকলার পরিচয় দেয়। খোদিত মূর্ত্তিগুলি সজীব বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে পাঁচটি গোপুরম্ আছে। ইহার তুইটি বন্ধ, তিনটি খোলা।

মন্দির মধ্যে গর্ভগৃহ একটি দেখিবার বিষয়। ইহার নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত শিল্পকার্য্যে শোভিত। অভ্যন্তরের বিগ্রহ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, অনন্ত শয্যায় শায়িত; শেষ নাগ পঞ্চ ফণা বিস্তারপূর্ব্বক ভগবানের মস্তক আচ্ছাদন করিয়া আছে। পার্শ্বে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের বাহিরে পশ্চিম দিকে পট্টমারাহ নামে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। প্রবাদ—হেম ঋষি ভগবানকে লাভের নিমিত্ত এই সরোবরের তীরে বসিয়া কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গোলোকবিহারী ভগবান সারঙ্গসহ অনন্তমূর্ত্তিতে আসিয়া দর্শন দেন। সেই মূর্ত্তি এ স্থানে স্থাপিত এবং সেজন্য বিগ্রহের নাম শার্ঙ্গপাণি।

চক্রপাণি ও নাগেশ্বর মন্দির

চক্রপাণি ও নাগেশ্বর মন্দির ঃ—ইহা কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার গোপুরও অন্য মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট। মূলমন্দিরে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। এ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নাগেশ্বর মন্দিরে যাওয়া হইল। এস্থানে নাগেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, পুরাকালে সূর্য্যদেব এস্থানে আসিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। মন্দিরটি এরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত যে, সূর্য্যরশ্মি গোপুরের মধ্য দিয়া মন্দির অভ্যন্তরে লিঙ্গোপরি পতিত হয়। এখানের দর্শন শেষ করিয়া তিরুবান্নমলয়ে রওনা হইলাম।

তিরুবান্নমলয়

তিরুবান্নমলয় ঃ—এ স্থানটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সহর ও মন্দিরাদি নিকটেই বর্ত্তমান। এখানকার প্রধান দেবতা শিবলিঙ্গ, নাম তিরুবান্নমলয়েশ্বর। দেবীর নাম অপিতকুচম্বল। এই পাহাড়ের প্রস্তরগুলির বর্ণ লাল বলিয়া ইহার নাম অরুণগিরি। দেবালয়টি সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথমটি উৎসবমণ্ডপ। ইহার সহিত পরপর ছয়টি প্রকোষ্ঠ সংলগ্ন। মূলমন্দির অন্ধকারময়। আলো ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এখানে শিবলিঙ্গের তেজমূর্ত্তি স্থাপিত। প্রবাদ—পুরাকালে কোন এক সময়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজ নিজ প্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। বাক্‌যুদ্ধের সময় উভয়েই ভুলিলেন যে তাঁহাদের মত শক্তিশালী পুরুষ আরও একজন আছেন। মহেশ্বর উভয়ের মধ্যে নিজের বীর্য্য প্রমাণার্থে সহসা মেদিনী ভেদ করিয়া এক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখারূপে উঠিলেন। এই শিখাটি গগন ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইল। এই শিখার স্বরূপ নির্ণয়ার্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে সচেষ্ট হইলেন। শিখার উর্দ্ধগতি দেখিবার জন্য ব্রহ্মা হংসে করিয়া শূন্যে উঠিলেন আর বিষ্ণু বরাহরূপে দন্তের দ্বারা মেদিনী ভেদ করিয়া শিখার উৎপত্তি নির্ণয় করিবার জন্য ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ইহাতে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইলেন।

হিন্দু প্রতিমা তত্ত্বে এই দৃশ্যকে লিঙ্গোৎসব বলে। দক্ষিণের অধিকাংশ শিব মন্দিরের বহির্গাত্রে এই দৃশ্য অঙ্কিত আছে।

এই শিখারূপী মহেশ্বর মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে উত্থিত হন। সেই হইতে উক্ত দিবস শিবরাত্রি নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কার্ত্তিক মাসে শিব আরাধনা করিবার জন্য এস্থানে আগমন করেন। তাহাদের সন্তোষবিধানার্থে মহেশ্বর এই দিন তেজমূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করেন। এই জন্য অদ্যাবধি এখানে কার্ত্তিক মাসে দীপম্ মেলার অনুষ্ঠান হয়। তিরুবান্নমলয় শিল্পও এই মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। মহাপুরুষ অরুণগিরি তামিল ভাষায় টিরুপ্পমল নামে ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। সেই মহাত্মার ও তাঁহার আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি পঞ্চম পর্ব্বতে স্থাপিত আছে। এখানকার দর্শন শেষ হইলে তাঞ্জোর রওনা হইলাম।

তাঞ্জোর

তাঞ্জোর ঃ—তাঞ্জোর ষ্টেশনে নামিয়া আমরা দূর হইতে মন্দিরের গগনভেদি চূড়া দেখিতে পাইলাম এবং ঝট্কাযোগে সহরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার, উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতেছে। সহরে অনেকগুলি ছত্রম্ ও হোটেল আছে। রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের গম্বুজটি ভগ্ন অবস্থায় অতীত ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান। এখানকার বৃহদেশ্বর মন্দির অতি বৃহৎ। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর এবং প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত। মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। সম্মুখে মণ্ডপ, তন্মধ্যে প্রস্তরখোদিত শিববাহন বৃষদেব চরণ গুটাইয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট। বেদীর

চারিদিক লৌহরেলিং বেষ্টিত। মন্দিরের উত্তরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যান ও ইহার নিকট শিবগঙ্গা নামে এক সরোবর আছে।

তাঞ্জোর নাম উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঞ্জোর নামে এক দৈত্য এ স্থানে বাস করিত। তাহার অত্যাচারে পার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণ প্রপীড়িত হইয়া ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। ভগবান বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকে সংহার করেন। মৃত্যুকালে দৈত্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে যে, এ স্থানটি যেন তাহার নামে অভিহিত করা হয়। ভগবান দৈত্যের প্রার্থনানুসারে এ স্থানের নাম তাঞ্জোর রাখিলেন।

তেরুভ্যালুম

তেরুভ্যালুম ঃ—তেরুভ্যালুমে পৌঁছিয়া গোযানে করিয়া মন্দির দর্শনে রওনা হইলাম। ষ্টেশন হইতে মন্দির এক মাইল। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ বাল্মীকেশ্বর। মন্দির উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত; প্রবেশের জন্য চারিটি গোপুরম্ আছে। আমরা দক্ষিণ গোপুরম্ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তৎপর বৃহৎ সরোবর কমলালয়। ইহার চারিদিকে প্রস্তর সোপানাবলী, মধ্যস্থলে দ্বীপের উপর মন্দির অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজা হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে এখানে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঙ্গণমধ্যে সাংখ্যতীর্থ নামে একটি কূপ আছে। প্রবাদ—চৈত্র পূর্ণিমায় এই কূপে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

ত্যাগরাজা

ত্যাগরাজা ঃ—মূলমন্দিরের উত্তর প্রাঙ্গণে রথের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এই মন্দির। ইহার দুইপার্শ্বে চারিখানি চাকা, সোপানের দুইদিকে অশ্ব সংযোজিত। ইহার মধ্যে ত্যাগরাজার মূর্ত্তি স্থাপিত। একটি চাকার তলায় এক বালক নিষ্পেষিত হইতেছে এবং কিছু দূরে একটি গাভী উহার মৃত বৎসের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া আছে।

কথিত আছে, রাজা মুচুকানন্দ ইন্দ্রের নিকট এই বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। ত্যাগরাজা ভারতে ৩৬৪টি লীলা করেন। তন্মধ্যে একটি লীলা এখানে প্রকটিত হইয়াছে। চোলার রাজা মনু ত্যাগরাজার একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিচার পরীক্ষার্থে ত্যাগরাজা নিজে গাভীর মূর্ত্তি ধরিয়া এবং যমকে বৎসের মূর্ত্তি ধরাইয়া পথে বিচরণ করিতে থাকেন। সে সময় রাজপুত্র রথে আরোহণ করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ বৎসটি রথচক্রতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। গোবৎসহত্যার অপরাধে ভীত হইয়া রাজপুত্র ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে বৎসহারা গাভী উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া শৃঙ্গের দ্বারা ঘণ্টাটি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া রাজা মন্ত্রীদের ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ঘটনাটি রাজাকে জানাইল। রাজা দেখিলেন জীবের সন্তানবিয়োগ অপেক্ষা অধিক শোক আর নাই। তাই গোবৎস হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের

আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, যেভাবে রথের চাকার তলায় পড়িয়া বৎসটি মারা গিয়াছে ঠিক সেইভাবে রাজপুত্রকেও প্রাণ হারাইতে হইবে। মন্ত্রী রাজার এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। তাহাতেও রাজা বিচলিত না হইয়া স্বয়ং পুত্রকে রথের চাকার তলায় নিক্ষেপ করিয়া রথ চালনা করিলেন এবং পুত্রের মৃত্যু হইলে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রাজ্যমধ্যে হাহাকার উঠিল কিন্তু রাজা তাহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ত্যাগরাজা ভক্তের এরূপ ধর্ম্মবিচারে লজ্জিত হইয়া পার্ব্বতীসহ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গোবৎস, মন্ত্রী ও রাজপুত্রকে পুনঃর্জীবিত করিয়া সকলকে সহ কৈলাসে গমন করিলেন।

মাদুরা

মাদুরা ঃ—তাঞ্জোর হইতে আমরা মাদুরা আসিয়া পৌঁছিলাম। মাদুরা বেগবতী নদীর তীরে অবস্থিত। সহরের রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও উভয় পার্শ্বের দোকানগুলি নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ। এ সব দেখিতে দেখিতে আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দেখিতে দুর্গের ন্যায়। প্রথমে লোহার রেলিং, তার পর উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর। প্রবেশের জন্য নয়টি বৃহৎ গোপুরম্ আছে। প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া বাজার আছে। প্রাতে ৯টার পূর্ব্বে দেবদর্শন হয় না। কিন্তু মন্দিরটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি আদর্শ স্থান জানিয়া ইহা দেখিবার জন্য অতি প্রত্যুষেই মন্দিরে আসিয়াছিলাম।

দেবালয়টি দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ও উত্তরভাগে সুন্দরেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পূর্ব্বদিক ভিট্রাভ্‌মল রাস্তার উপর প্রশস্ত পূর্ব্ব গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ দালানের মধ্য দিয়া মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে মণ্ডপে অষ্টশক্তির আটটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত মীনাক্ষী দেবীর জন্মবৃত্তান্ত হইতে যুদ্ধ ইত্যাদির চিত্র দেওয়ালে অঙ্কিত আছে। মণ্ডপে নানাপ্রকার খেল্‌না ও ফলফুলাদির দোকান রহিয়াছে। মণ্ডপের শেষাংশে একটি দ্বার আছে। উহার বামপার্শ্বে গণেশের মূর্ত্তি ও দক্ষিণে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই দ্বারের অপরদিকে মহাদেবের শবর মূর্ত্তি, বামদিকে পার্ব্বতীর শবরী মূর্ত্তি অবস্থিত। এখানকার মন্দির ও গোপুরগুলির আপাদমস্তক নানাপ্রকার ভাস্করকার্য্যে ও দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পূর্ণ। পশ্চিমের তোরণ পথ অতিক্রম করিয়া তোতামণ্ডপ, ইহার প্রত্যেকটি স্তম্ভ অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

আমরা মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, মধ্যস্থলে মীনাক্ষী দেবীর মাতৃমূর্ত্তি নানাপ্রকার মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে ভূষিত। দেবীর চক্ষুদ্বয় মৎস্যচক্ষুর ন্যায় বলিয়া নাম মীনাক্ষী দেবী। দ্বারের সম্মুখে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। দরদালানের উত্তর প্রান্তে শতস্তম্ভ মণ্ডপ। এই মণ্ডপের মধ্যে শিবের পঞ্চবিংশতি অবতার মূর্ত্তি খোদিত। এই দ্বারের মধ্য দিয়া সুরেশ্বর শিবমন্দিরের সম্মুখীন হইলাম। মূলমন্দিরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। শত শত

গৌরীপীঠের উপর চন্দনাদি ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা সজ্জিত লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত।

মীনাক্ষী দেবীর বিবাহ—মীনাক্ষী দেবী রাজকন্যা ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে, কিন্তু বিস্তারিত ভাবে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার পীঠে তিনটি কুজ ছিল। জ্যোতিষরা গণনা করিয়া রাজাকে বলেন,—আপনার কন্যা সুলক্ষণা। যত্নে পালন করুন কিন্তু বিবাহের জন্য কদাচ বর সন্ধান করিবেন না। যে পুরুষ দর্শনে কন্যার কুজ স্খলিত হইবে তিনিই ইহার পতি হইবেন। একদা খেলা করিবার সময় শিবদর্শনে কন্যাটির একটি কুজ অদৃশ্য হয়। এই ঘটনায় রাজা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই বিবাহ সভায় ত্রিভুবনের লোক যোগদান করেন। সেই হইতে এখানে পৌষ মাসে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিবাহের পর অনেক খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত হয়। এই সকল খাদ্যদ্রব্য কি করা হইবে রাজা তাহা ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় শিবের পারিষদ গঙ্গাধারী নামে এক ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দেবীর নিকট আসিয়া ভোজনপ্রার্থী হন। দেবী যত্নসহকারে তাহাকে ভোজন করাইতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে বিপুল রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল তথাপি গঙ্গাধারীর উদর পূর্ণ হইল না। নিরুপায় হইয়া দেবী শিবের শরণাপন্ন হইলেন; শিব অন্নপূর্ণাকে আনিয়া গঙ্গাধারীর উদর পূর্ণ করিলেন। গঙ্গাধারীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করা হয়। এখানে সেই গঙ্গা পতিতপাবনী পাপনাশিনী নামে অভিহিতা

হইলেন। জনশ্রুতি আছে, এই পবিত্র জলে মৃত ব্যক্তির কণামাত্র অস্থি পতিত হইলে সে মুক্তি পায়। সেই পবিত্র গঙ্গা এখন মাতুরায় বেগবতী নামে প্রসিদ্ধ। মাতুরার সকল দর্শনান্তে আমরা রামেশ্বর যাওয়া স্থির করিলাম।

রামেশ্বর

রামেশ্বর :—প্রাতে রামেশ্বর আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা সহরের মধ্য দিয়া মন্দির অভিমুখে গিয়াছে। মন্দিরের নিকট ধর্ম্মশালাতে যাত্রীরা থাকিতে পারে। আর কতকগুলি ছত্রম্ আছে। সেখানে সাধু ও সন্ন্যাসীদের আহার্য্য দ্রব্য নিত্য ভিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত সরকারী হাঁসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি আছে। এখানে গোযান ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নাই।

রামেশ্বর বা পাম্বান দ্বীপ আকারে ছোট হইলেও স্থান মাহাত্ম্যের জন্য মহাতীর্থ। ত্রেতাযুগে যখন রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন তখন দুরন্ত লঙ্কাপতি রাবণ ছলনাপূর্ব্বক সীতাদেবীকে হরণ করেন। ইহার পর রামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে ভক্ত জটায়ু পক্ষীর নিকট রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হন। সত্বর রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার রাজধানী হেম্পী নগরে যাইয়া বালিরাজার ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সুগ্রীব জানিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র তাঁহার রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছেন।

তিনি তখন পারিষদ সহ আসিয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা যাইয়া রাবণের কবল হইতে সীতা উদ্ধারার্থে সুগ্রীবের নিকট সেতু বন্ধনের জন্য সাহায্য চাহিলেন। অচিরে সুগ্রীব বিরাট বানর বাহিনী লইয়া সেতু নির্ম্মাণার্থে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মাণ্ডাপমের কয়েক ক্রোশ হইতে সেতু গঠন কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই পাম্বান দ্বীপকে সেতু দিয়া ভারতের সহিত যোগ করেন। অতঃপর তাঁহারা ঐ দ্বীপস্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করতঃ স্বর্ণলঙ্কা অবলোকন করিয়া পুনরায় ধনুষ্কোটী হইতে সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধিচাতুর্য্যে এবং সুগ্রীবের বানর সৈন্যের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র এই সেতু নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করেন। সেতুটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ষোল ক্রোশ,—বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও বালির সংযোগে নির্ম্মিত। মাণ্ডাপমে আসিতে আইল পথের উপর দিয়া যে রেললাইন আসিয়াছে উহা এই সেতুরই অংশবিশেষ। রেলকোম্পানী যে পাম্বান ব্রীজ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাও এই সেতুর উপর গঠিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে জলের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। সেতুটি ধনুষ্কোটী হইতে লঙ্কার তিনমাইল নিকটবর্ত্তী মাল্লার দ্বীপ পর্য্যন্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান।

শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, নল, নীল, জম্বুবান এবং হনুমান প্রভৃতি শত সহস্র বানর সৈন্য সহ এই সেতুর উপর দিয়া সাগর অতিক্রম করিয়া দুর্ভেদ্য লঙ্কাপুরী অবরোধ করেন। অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত লঙ্কাপতি রাক্ষসরাজ রাবণকে

যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতা উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুরাণে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে রাবণের জন্ম হয় বলিয়া রাবণ দ্বিজমধ্যে গণ্য। রাবণ বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন। এই পাপখণ্ডন ও লোকশিক্ষার জন্য মুনিঋষির আদেশানুসারে পাম্বন দ্বীপে গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করেন। লিঙ্গমূর্ত্তি হনুমান দ্বারা হিমালয় হইতে আনীত হয়। কিন্তু হনুমান নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে লিঙ্গ লইয়া পৌঁছিতে না পারায় সকলে উৎকণ্ঠিত হইলে, সীতাদেবী একটি বালির লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠান করিলেন। বালুকাময় মূর্ত্তিটি জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার পর রামনাথ নামে মূর্ত্তিটিকে যথাবিহীত ভাবে পূজা করা হইল। এই সময় হনুমান দুইটি লিঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হনুমান দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের আনীত লিঙ্গমূর্ত্তি পীঠস্থানে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে লাঙ্গুল দ্বারা বালুকা মূর্ত্তিটি বেষ্টন করিয়া স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে রামচন্দ্রের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া দীনতা প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র হনুমানের দৈন্যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি দুইটিকে বালুকা মূর্ত্তির অনতিদূরে স্থাপন করেন। রামেশ্বরের অঙ্গে অদ্যাপি হনুমানের আঙ্গুল বেষ্টনের চিহ্ন বর্ত্তমান।

রামেশ্বর স্বামী

রামেশ্বর স্বামী ঃ—এ স্থানটি বালুকাময় ও লবণাক্ত। এ কারণে এখানে কোন শষ্য জন্মে না। প্রাচীনকাল হইতে রামেশ্বর পুণ্য তীর্থ। প্রায় ৫১ বিঘা জমিতে মন্দিরটি অবস্থিত ও ২০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশের চারিটি গোপুর আছে। পূর্ব্বদ্বার প্রবেশের জন্য প্রশস্ত। গোপুরম্‌গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং উপরিভাগের ভার লাঘব করিবার জন্য প্রবাল চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত। এই প্রস্তর দেখিতে ঝামার ন্যায় এবং অত্যন্ত লঘু। মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন। গোপুরগুলির গাত্রে নানা দেবদেবী ও রামচন্দ্রের পারিষদ বর্গ এবং বীরগণের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। প্রবেশ দ্বারের তুই পার্শ্বে অলিন্দ মধ্যে কার্ত্তিক ও গণপতির মূর্ত্তি স্থাপিত। গোপুর অতিক্রম করিয়া কয়েকটি সোপান নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। সোপান শেষে একটি প্রশস্ত দীর্ঘ মন্দির প্রবেশের রাস্তা ও উভয়দিকে প্রশস্ত মঞ্চ। ইহার উপর শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভরাজি। ইহারা রাস্তা ও মঞ্চের ছাদ রক্ষা করিতেছে। রাস্তার উভয়পার্শ্বে প্রতি স্তম্ভগাত্রে মনুষ্যমূর্ত্তি ও নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য খোদিত আছে। উভয়পার্শ্বের দোকানগুলিতে নানাপ্রকার সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি, শামুক, ছবি, তালপাতার বিচিত্র খেলনা ও স্ফটিক, রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। এই পথটি মন্দিরের প্রথম দরদালানের মধ্যস্থলে যাইয়া যুক্ত হইয়াছে। প্রথম দালানটি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর দক্ষিণে অনেকটা প্রশস্ত।

মধ্যস্থলে প্রশস্ত রাস্তা। ইহার পর আর একটি দালান। তাহাও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। এই দালানটি পূর্ব্ব বর্ণিত দালান অপেক্ষা পুরাতন এবং উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের নিদর্শন। এই দালানের পূর্ব্বদিকে মূল মন্দিরের প্রবেশের দ্বার। এখানে মণ্ডপমধ্যে রামেশ্বর স্বামীর পর্ব্বতবর্দ্ধিনী আসন। বিশ্বনাথ স্বামী ও বিশালক্ষ্মীর আসনের উপর মন্দির স্থাপিত। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মণ্ডপটিকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই মন্দিরের আভ্যন্তরিক দরদালানের ন্যায় প্রকাণ্ড দরদালান বড় একটা দেখা যায় না।

আবহমানকাল হইতে শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের দশ অবতারের মধ্যে বিষ্ণু অবতার। তিনি স্বহস্তে এই রামেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় আনিয়া দেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে সমানভাবে পূজাদি করিয়া থাকে। গর্ভমন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া একটি স্তম্ভের নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড বৃষদেবের মূর্ত্তি দেখা গেল। নাটমন্দিরের মধ্যদেশে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত তালগাছ, শত শত দীপালোক তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্‌মিক করিতেছে। ইহার পর সুবর্ণনির্ম্মিত রেলিং বেষ্টিত একটি নদী, যাজকগণ উহার উপর বসিয়া বেদ পাঠ করেন। অতঃপর মূল মন্দির। তন্মধ্যে স্থবর্ণ বেদীর উপরে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ একটি সুবর্ণনির্ম্মিত পঞ্চমুখ টোপর দিয়া ঢাকা থাকে।

মস্তকোপরি ছত্ররূপী পঞ্চফণা বিস্তারিত কালনাগিনী মূর্ত্তি। এই মন্দির অভ্যন্তরে পূজারী ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ অধিকার নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে অন্য মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার পার্শ্বে লক্ষণ ।বভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতির মূর্ত্তিও আছে। মূল মন্দিরের দক্ষিণভাগে হনুমান হনুমান আনীত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবদর্শনান্তে রামেশ্বরী দেবী দর্শনে অন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

রামেশ্বরী দেবীর মন্দির সম্মুখে স্বুবর্ণ তালবৃক্ষ, তৎপরে একটি বেদী। মন্দির মধ্যে মণিমুক্তাখচিত বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত মাতৃমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি দর্শনে নয়ন চরিতার্থ হইল। পার্শ্বে একটি স্বর্ণময়ী ভোগমূর্ত্তি স্থাপিত। উৎসবের সময় এ মূর্ত্তিকে বাহিরে আনা হয়। অতঃপর একটি বৃহৎ মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলাম। ইহার বামপাশের ঘরে হনুমানের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি অবস্থিত। ফটকের সম্মুখ হইতে একটি গলি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে বিশাল সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হয়। রামেশ্বর ব্যতীত এখানে আরও ১৩টি তীর্থ আছে। সেগুলি যাত্রী মাত্রেরই দর্শনীয় বিষয়।

রামেশ্বরের মন্দিরে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। ইহাতে পাণ্ডা ও যাত্রী উভয়েরই লাভ। বৈশাখে বসন্ত উৎসব, জ্যৈষ্ঠে প্রতিষ্ঠা উৎসব, আষাঢ়ে বিদ্ধোৎসব, শ্রাবণে দশহরা, কার্ত্তিকে বক্ষোৎসব, অগ্রহায়ণে উপউৎসব, পৌষে কুলিউৎসব, মাঘে

মাঘোৎসব, ফাল্গুনে মহাভিষেক ও চৈত্রে অধিবাস উৎসব অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

পূজা

পূজা ঃ—রামেশ্বরের পূজা পুরাকালের পদ্ধতি অনুসারে হইয়া আসিতেছে। প্রাতে ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে হনুমান মন্দিরের নিকটে পদসেবক আসিয়া তিনবার শঙ্খধ্বনি করে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের জয়ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। এইরূপ অন্যান্য দ্বারেও শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। উষা ও দিবার সন্ধিস্থলে জনমণ্ডলী যখন নিদ্রিত থাকে তখন মন্দির হইতে মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয়। সানাইর সঙ্গে মৃদঙ্গের গম্ভীর রোল আর সাগরের মৃদুমন্দ গর্জ্জন মিলিয়া এক অভিনব সুমধুর ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাদ্যধ্বনি হইবার পূর্ব্বে মন্দিরের দ্বারী, পূজারী মণ্ডপদ্বারে জনমণ্ডলীর জন্য অপেক্ষা করে। এ সময় এক নর্ত্তকীও স্নানান্তে আলুলায়িত কেশে, পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া দ্বারে উপস্থিত হয়। অতঃপর মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে পূজারী ব্রাহ্মণগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলারতি সমাপন করেন। তৎপরে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করেন। পূজার বিভিন্ন কার্য্যের ভার বিভিন্ন লোকের উপর ন্যস্ত আছে। গুরুকুলের উপর পূজার, সেবাচার্য্যের উপর পূজার উপকরণ সরবরাহের এবং সেবাইতের উপর দেবতার ভোগ, নৈবেদ্য ও অভিষেকাদি কার্য্যের ভার অর্পিত আছে।

এখানকার লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, যখন পূজকগণ পূজার উপকরণ লইয়া মহামণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হন তখন আপনা হইতে দ্বার খুলিয়া যায়। জানিনা, ভগবৎ মহিমার সঙ্গে এখানকার লোকের কোন চাতুরী আছে কি না! দ্বার খুলিলে প্রধান পূজারী রামনাথস্বামীর পূজার্থে মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অর্ঘ্য দান করেন, তৎপরে স্বুবর্ণনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তিকে বাহির করিয়া স্বুবর্ণশিবিকায় স্থাপন করতঃ মন্দির প্রদক্ষিণ করান হয়। ইহার সঙ্গে রৌপ্যছত্র, চামরাদি সহ নর্ত্তকী, বাদ্যকরও বাহির হয়। বিগ্রহকে চন্দ্রকেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে আনয়ন করিয়া পুনরায় পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক মন্দিরে ফিরিয়া আনা হয়। ইহাই নিত্য ক্রিয়াপদ্ধতি। বিগ্রহের স্নানের জন্য রৌপ্য কলসীতে জল হস্তীপৃষ্ঠে বহন করিয়া আনা হয়। একখণ্ড প্রজ্বলিত কর্পূর ঐ জলে নিক্ষেপ করতঃ জল শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এই দ্বীপে আরও ছোট বড় ৩৮টি পীঠস্থান আছে। তন্মধ্যে ১৬টি মন্দিরাভ্যন্তরে, অপরগুলি দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রতীর্থ, বেতালতীর্থ, পাপবিনাশন, সীতাতীর্থ, মঙ্গল তীর্থ, অমৃত সরোবর, ব্রহ্মা সরোবর, হনুমান সরোবর, অগস্ত তীর্থ, শ্রীরাম তীর্থ, অগ্নি তীর্থ, জটা তীর্থ, শ্রীলক্ষ্মী তীর্থ, শিব তীর্থ, শঙ্খ তীর্থ, যমুনা তীর্থ, গঙ্গা তীর্থ, গয়া তীর্থ, কোটী তীর্থ, সাধ্যামৃত তীর্থ, মনসা তীর্থ, গবাক্ষতীর্থ, অঙ্গদ তীর্থ, গজতীর্থ, গরুড় তীর্থ, কুমুদ তীথ, পাণ্ডার তীর্থ ও ধনুষ্কোটী তীর্থ। তীর্থগুলির অধিকাংশই কূপ অথবা সরোবর।

এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয় শেষ করিয়া আমরা ধনুষ্কোটী যাত্রা করিলাম।

ধনুষ্কোটী

ধনুষ্কোটী ঃ—রামেশ্বর হইতে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত সেতুর উপর রেললাইন হইয়াছে। বেলা ১০টায় আমরা সেখানে যাইয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনটি অতি ক্ষুদ্র, কেবল রেলকর্ম্মচারীদের থাকিবার মত ঘর আছে। এ স্থানটিও বালুকাময় ও জল লবণাক্ত। এ কারণে পানীয় জল রামেশ্বর হইতে সরবরাহ হয়। ষ্টেশন হইতে ধনুষ্কোটী যাওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইলে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে ছোট একখানি রামসীতার মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বিরাজিত। সাগর স্নান সমাপ্ত করিয়া বালির শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করা হইল। ধনুষ্কোটী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। এখানে স্নান করিলে নাকি সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয় ও দান করিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায়। স্নানের নির্দ্দিষ্ট কোন ঘাট নাই। ধনুকের ন্যায় সমুদ্রতটের বক্রাকার স্থানটিই স্নান মাহাত্ম্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এ স্থানে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নাই। ইহার অনতিদূরে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থল। ইহাকে রত্নাকর বলে। উহা দেখিবার জন্য তীরস্থ পথ ধরিয়া সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম।

ভারতের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বিভব দেখিয়া বিস্ময়ে যেন অভিভুত হইলাম। এই দুই সাগরের জল পরস্পর মিলিতে

যেন অনিচ্ছুক! একদিকের স্থির নীলাম্বুরাজি, অপরদিকে উত্তাল তরঙ্গরাশি ভীষণ বেগে পতিত হইতেছে। ভারতের এই অন্তরদ্বীপের শেষ সীমানায় বালুতটে বসিয়া প্রকৃতির মহান্ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখে ফেনায়িত জলের উচ্ছ্বাস্, দূরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুরাশির নীলিমায় একাকার ভাব, পশ্চাতে তরুশূন্য বিশাল বালুকাকীর্ণ ভূমি। এই নৈসর্গিক দৃশ্যে অন্তর যেন এক অব্যক্ত ভাবে ভরিয়া উঠিল।

রাবণ পুলস্ত ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। তাহার নিধনে শ্রীরামের ব্রহ্মহত্যার পাপ হওয়ায় লঙ্কা বিজয় করিয়া ফিরিবার কালে দেখিতে পাইলেন তাঁহার দেহের দুইটি ছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন একটি ছায়া পাপার্জ্জিত। রামচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগমনের পর ঋষিদের পরামর্শ অনুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে একটি ছায়া অন্তর্হিত হইল। পরে এই সাগরসঙ্গমে স্নান করাতে অবশিষ্ট পাপ নাশ হয়। এ কারণে স্থানটি মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত। রামচন্দ্র স্নানে পাপমুক্ত হইলে, পাছে পুণ্যলাভের আশায় রাক্ষসরা আসিয়া সেতুভঙ্গ করে এই আশঙ্কায় লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতু দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেন। তাই এস্থানের নাম ধনুষ্কোটী হইয়াছে।

ত্রিচিনাপল্লী

ত্রিচিনাপল্লী ঃ—প্রাতে ত্রিচিনাপল্লী পৌঁছিলাম। ষ্টেশনটি বেশ বড়। আধ ঘণ্টা অন্তর এক একটি গাড়ী কোটি ষ্টেশন

হইতে ত্রিচিনাপল্লীতে যাতায়াত করে। ইহা নামে পল্লী হইলেও প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ সহর। ষ্টেশনে গোযান ও অশ্বযান পাওয়া যায়। প্রায় দুই মাইল রাস্তা অশ্বযানে অতিক্রম করিয়া দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। উচ্চ প্রাচীর ও চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত তোরণটি মানুষের মনে স্বভাবতঃই যেন ভীতির সঞ্চার করে। তোরণ সম্মুখে বৃহৎ ত্রিচিরক দুর্গ ও বামভাগে প্রস্তর বাঁধান ঘাট সমন্বিত একটি নয়নাভিরাম সরোবর। দূর হইতে ইহাকে পার্ব্বতীয় হ্রদ বলিয়া ভ্রম হয়। সহরের ভিতরে অনেকগুলি ছত্রম্ আছে।

রককোটি

রককোটি ঃ—রককোটি তোরণ দ্বার অতিক্রম করিয়া সহরের রাস্তা। অল্পদূরে ছোট একটি বাজার। কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পার্ব্বত্য মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতটি বহু উচ্চে মাথা তুলিয়া যেন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। মসৃণ সোপানশ্রেণী ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে। প্রথমেই সোপানের উভয়পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সোপানের পার্শ্বে চাতাল। তাহার নিকটেই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি। ইহার পর দুইটি শতস্তম্ভ মণ্ডপ। দ্বারে প্রস্তরময় দুইটি ভীমকায় দ্বারপাল। ভিতরে কোন মূর্ত্তি নাই। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে মহাসমারোহে এ স্থানে বিগ্রহের উৎসব হয়। আরও উর্দ্ধে একটি মন্দিরমধ্যে স্তম্ভরাজি। ইহাতে বিষ্ণুর বিনায়ক

মূর্ত্তি স্থাপিত। পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিতে লাগিলাম। সোপানবলী শেষ হইলে একটি গণপতির মন্দির ও এক মহাত্মার সমাধিমন্দির দর্শন করিলাম। শিখর হইতে বহুদূর দৃষ্টিগোচর হয়। অনন্ত আকাশ ও দূরে শ্রীরঙ্গপট্টমের মন্দিরটি যেন পটে অঙ্কিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলকলনিনাদিনী কাবেরী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত হইলে মনে হয় যেন শীর্ণ শুভ্র রজত রেখা আঁকাবাঁকা ভাবে দূরদিগন্তে মিলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করতঃ আহারান্তে শ্রীরঙ্গম্ দর্শন মানসে গমন করিলাম।

শ্রীরঙ্গপট্টম

শ্রীরঙ্গপট্টম ঃ—ত্রিচিনাপল্লী হইতে ছয় মাইল ব্যবধানে শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপ অবস্থিত। পুণ্যভূমি কলুষিত হইবার আশঙ্কায় একদিকে কোলাদাম, অপরদিকে কাবেরীর পবিত্র ধারা স্থানটিকে উপদ্বীপে পরিণত করিয়াছে। কাবেরীর উপর একটি বৃহৎ সেতু অতিক্রম করিয়া অপর পারে পৌঁছিলাম। স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া দেবদর্শনে গমন করিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, দক্ষিণে শ্রীরঙ্গমের মন্দির বিখ্যাত। প্রকৃতই ইহা বৃহৎ ও প্রাচীন।

কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যখন রাজ্য লাভ করেন তখন অভিষেক উপলক্ষ্যে অকাতরে সকলকে ধনরত্ন বিতরন করেন। তাঁহার এইপ্রকার দান দেখিয়া বিভীষণও প্রার্থী হইলেন। ইহাতে রামচন্দ্র

মনে মনে ভাবিলেন ইহার ন্যায় ব্যক্তিকে কি দানে তুষ্ট করা যায়। যাহা হউক, তিনি ইক্ষাকু বংশের কুলদেবতা সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীরঙ্গমনাথকে বিভীষণের করে অর্পন করিয়া বলিলেন তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। তোমার সাহায্যেই সীতা উদ্ধার করিয়া আজ রাজ্যলাভ করিয়াছি। তোমায় যে মহামূল্য বস্তু দিতেছি ইহা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। এই মূর্ত্তি লঙ্কায় স্থাপনপূর্ব্বক সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে কিন্তু পথে কোথাও মূর্ত্তি ভূমিতে স্থাপন করিবে না। আশাতীত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক রাম ভক্ত বিভীষণ হরষিত চিত্তে বিগ্রহ লইয়া ব্যোমযানে লঙ্কা অভিমুখে গমন করেন। পথিমধ্যে এই দ্বীপের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ও কাবেরীর পবিত্র ধারা বিভীষণের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি স্নান ইচ্ছুক হইয়া দ্বীপে অবতরণ করিলেন। বিগ্রহ কাহার নিকট রাখিয়া স্নান করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তখন একটি গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ বালক হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। বিভীষণ তাহাকে বিনীতভাবে বলিলেন—হে দ্বিজোত্তম! এই বিগ্রহ ধারণ কর! আমি কাবেরীতে স্নান করিয়া আসিতেছি। বালক সানন্দে বিগ্রহটি ধারণ করিল, কিন্তু বিভীষণ অন্তরাল হইলে বালক বিগ্রহটি ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। বিভীষণ স্নানান্তে আসিয়া দেখিলেন বালক বিগ্রহ রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া সত্বর যাইয়া বিগ্রহ উত্তোলনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! বিগ্রহটি বিশ্বম্ভররূপে

দৃঢ়বদ্ধভাবে সেই স্থানেই রহিয়া গেল। বিভীষণের বৃথা চেষ্টা দেখিয়া ছদ্মবেশী বালক অদূরে দাঁড়াইয়া উপহাস ছলে হাসিয়া উঠিল। বিভীষণ ইহাতে রোষে একটি প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া বালককে আঘাত করিলে বালক অন্তর্হিত হইল। রামভক্ত শেষে বুঝিলেন যে ইহা দেবমায়া এবং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক এই বলিয়া চন্দ্রপুষ্করিণীর তীরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিমানযোগে লঙ্কা যাত্রা করিলেন।

শ্রীরঙ্গমস্বামীর মন্দির

শ্রীরঙ্গমস্বামীর মন্দির :—এই মন্দির ত্রেতাযুগে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বীপের মধ্যস্থলে ৪৯৮ বিঘা জমির উপর স্থাপিত ও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। মন্দিরের আকাশভেদী গোপুরগুলি শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যার প্রভূত পরিচয় দিতেছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে নীল প্রস্তর খোদিত দশহস্ত পরিমিত শ্রীরঙ্গমজীর মূর্ত্তি অনন্তনাগশয্যায় শায়িত। কি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন মূর্ত্তি! নীল পদ্মপত্রের ন্যায় নেত্র ও ভ্রূযুগল শ্রুতিমূল স্পর্শ করিতেছে। হৃদয়দেশে কৌস্তুভ মণি শোভিত বনমালা। নানা রত্নশোভিত কনককিরীট যেন চিত্রভানুকে পরাস্ত করিয়া গরিমায় দীপ্ত। বিশ্বাধারে অঙ্গে যেন বিপুল বিশ্বের সৌন্দর্য্য একত্র সমাবিষ্ট। শঙ্খ চক্রে দ্বিভুজ শোভিত। শঙ্খ বিশ্বের মঙ্গলধ্বনি সহ অভয়বাণী হৃদয়ে আনিয়া দেয়। চক্র পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বের মূলাধার নাভিমূলরূপ সত্ত্বশক্তির আধার আশ্রয় করিয়া পদ্ম বিকশিত।

সেই পদ্মে রজোগুণের সৃষ্টিমূর্ত্তি ব্রহ্মা বিশ্বমূর্ত্তিতে ধ্যানস্থ। ভক্তবীর গরুড় সেখানে কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যানমগ্ন। শ্রীদেবী পরম দেবতার চরণ সেবায় নিযুক্ত। এইপ্রকার সসীম মূর্ত্তি দর্শনে যেন অসীমানন্দে অন্তর ভরিয়া উঠিল।

শ্রীরঙ্গমজী ভগবানের আদি মূর্ত্তি। বিশ্ব যখন প্রলয়পয়োধি-জলে নিমগ্ন ছিল তখন অনাদিপুরুষ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। ইহা সেই মূর্ত্তি। ফুলের মধ্যে যেরূপ ফলের সূক্ষ্মসত্ত্বা বীজরূপে নিহিত থাকে. ভগবান সেইরূপ বিগ্রহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে তীর্থাদিতে প্রকট হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। এ স্থান হইতে আমরা চিদম্বরমে গমন করিলাম।

চিদম্বরম্

চিদম্বরম্ ঃ—প্রভাতের সূর্য্যালোকে চিদম্বরম্ পেঁৗছিলাম। যাতায়াতের জন্য ঝট্কা ও গোযান পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি লালবর্ণ ও প্রশস্ত। উভয়পার্শ্বে নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে ছায়া বিস্তারপূর্ব্বক দণ্ডায়মান। সহরে হোটেল ও ছত্রম্ আছে। দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বত্রই সাধু, সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। আমরা ধর্ম্মশালায় বিশ্রামান্তে দেবদর্শনে বাহির হইলাম।

মন্দিরটি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। ইহার উত্তর দক্ষিণে প্রবেশের জন্য চারিটি গোপুরম্ আছে। গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রশস্ত রাস্তা মূল মন্দির অভিমুখে গিয়াছে। এখানে দুইটি স্বতন্ত্র মন্দিরে দেবী পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকের মূর্ত্তি

বিরাজিত। পার্ব্বতীর মন্দিরের দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি মঞ্চ। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত ময়ুর আছে। মন্দিরে উঠিবার সোপানের উভয় পার্শ্বে তুইটি হস্তীমূর্ত্তি। তৎপরে মণ্ডপ ও স্তম্ভ অতিক্রম করিয়া দেবীর মন্দির প্রকোষ্ঠ। মধ্যস্থলে সোণার তালগাছ। তৎপরে মূল মন্দির। মন্দিরে জগন্মাতার মূর্ত্তি স্থাপিত। অদূরে একটি ছোট মন্দির মধ্যে সুরেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরভাগে মূল মন্দির মধ্যে মহাদেব নটরাজ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। এ বিগ্রহের পশ্চিম কোণে ব্যোমরূপী মহাদেবের পূজা হয়। ইহার কোন মূর্ত্তি নাই তথাপি শত সহস্র যাত্রী ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব দর্শন মানসে এ স্থানে ছুটিয়া আসে। ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য নটরাজ মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে একটি কাল পর্দ্দা সর্ব্বদা ঝোলান থাকে। দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণ পাণ্ডার হাতে কিছু দর্শনী দিলে পর্দ্দা তুলিয়া দর্শন করাইয়া থাকে।

এই মন্দিরের অপর নাম কনকসভা। ইহার ছাত চালাঘরের ন্যায় ঢালু এবং সীসানির্ম্মিত সোনালি রংএর গিল্‌টি করা টালির দ্বারা আচ্ছাদিত। রৌদ্র বৃষ্টিতে শত শত বৎসরেও ইহার স্বর্ণবর্ণের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় নাই। হঠাৎ দেখিলে স্বর্ণ বলিয়াই ভ্রম হয়। মন্দিরের শিরোদেশে কলসাকৃতি নয়টি স্বর্ণচূড়া বিদ্যমান। এখানকার নটরাজ মূর্ত্তির বিষয়ে একটি পুরাতন কাহিনী আছে যে, পুরাকালে স্থানটি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সেই সময়ে কোন মহাত্মা তুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটিতে

শিব ও অপরটিতে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। দেবী নিত্য আশুতোষকে তাঁহার সহিত নৃত্যের জন্য আহ্বান করিতেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেন না। কারণ ভোলানাথ মহাযোগী বলিয়া এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন। একদা ভক্তের অনুরোধে দেবীর সহিত নৃত্য করিতে সম্মত হইলেন। এই সর্ত্তে নৃত্য আরম্ভ হইল যে, যিনি নৃত্যে পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে মন্দির ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। বিচারার্থে বিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া উভয়ে কালীমন্দিরের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এ নৃত্যের যেন আর বিরাম নাই! উভয়ে উভয়কে পরাস্ত করিতে সচেষ্ট। মহাদেব ১০৮ প্রকার নৃত্য করিলেন তথাপি দেবীকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিষ্ণু ইঙ্গিতে মহাদেবকে জানাইলেন—এমনভাবে নৃত্য করিতে হইবে যাহা দেবী আমার সম্মুখে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন। ইহাতে মহাদেব চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নগ্ন অবস্থায় দক্ষিণপদ ভূমিতে রক্ষা করিয়া ও বামপদ উর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবী আশুতোষের নৃত্যের এই ব্যভিচার দর্শনে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া চিরতরে মন্দির পরিত্যাগ করেন। মহাদেবের এই মূর্ত্তিই এখানে নটরাজ নামে প্রতিষ্ঠিত।

নটরাজের সন্ধ্যারতি একটি বিশেষ দর্শনীয় বিষয়। ইহা অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের আরতির ন্যায়। পূজারীগণ তান, লয়, সুরে বেদ স্তোত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন, তাহার সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যধ্বনি স্বভাবতঃই যেন দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার পর গোদাবরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গোদাবরী

গোদাবরী ঃ—প্রভাতের আলোক চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, বৃক্ষলতার পত্রগুলি শীতল সমীরণে মৃদু মৃদু নড়িতেছে, এই সময় গাড়ীখানি গোদাবরী ষ্টেশনে পৌঁছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঝট্কায় আরোহণপূর্ব্বক গোদাবরী নদীতীরে স্নানের জন্য অগ্রসর হইলাম। দূর হইতে গোদাবরীর উত্তাল তরঙ্গমালা স্ফীত হইয়া যেন আমাদের আহ্বান জানাইতেছে; ক্রমে আমরা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই নদীটি পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বঘাট ভেদ করিয়া বঙ্গোপসাগরে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে ইহা পবিত্র বলিয়া খ্যাত। ইহা সপ্তধারায় বিভক্ত—তুল্য, আত্রেয়ী, ভরদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধ গৌতমী, কৌশিকী ও বশিষ্ঠা। স্নানান্তে আমরা তীরস্থ এক ছত্রমে আশ্রয় লইলাম।

এইরূপ প্রবাদ যে, কোনকালে এই দেশে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু শস্যহানি ও জীবক্ষয় হওয়ায় কোন মহাপ্রাণ মুনি কৃপাপরবশ হইয়া যোগবলে আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিয়া এই গোদাবরীকে আনয়ন করেন।

নাসিক

নাসিক ঃ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে নাসিক পৌঁছিলাম। টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। এ স্থানটি দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে—লক্ষ্মণ এস্থানে সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। তাই ইহার নাম নাসিক। এখান হইতে

আট ক্রোশ দূরে চক্রতীর্থ। উৎপত্তি স্থান নিকটে বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। এ কারণে স্নানের বিশেষ সুবিধা। এ জন্য কুণ্ডপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নদীগর্ভ অসমতল হওয়ায়, জলপ্রবাহের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম। নদীটির উভয় পার্শ্বে দেবমন্দির ও লোকের বসতি। এখানে নানাদেশীয় রাজগণ দেবালয়, দানছত্র ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন।

নাসিকের গোদাবরীতটে কুম্ভমেলা হয়। সে সময় ভারতের বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সমাগম হয়। স্থানটি অতি মনোরম। এখানে গঙ্গার প্রবাহ ক্ষীণ। তাই উভয় তীর প্রস্তর বাঁধান ও মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া যেন বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তীরস্থ সোপানে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদগান করেন; তাহাতে দুই কূল মুখরিত হয়। তীরের একটি স্থান পর্ব্বতময়। পর্ব্বত কাটিয়া সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। জ্যোৎস্না. রাত্রির সন্ধ্যাকালে সেখানে বসিয়া দেবালয়ের 'রোশনচৌকী' শুনিতে শুনিতে ও রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জলমধ্যে পতিত রশ্মি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা আত্মহারার ন্যায় হইয়া যাইতাম।

কার্ত্তিকী পৌর্ণমাষীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন। তাই ঐ দিনে গোদাবরী তট দীপালোকে মণ্ডিত হয়। কপালেশ্বর ও রামলক্ষ্মণ মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটি অশ্ব সজ্জিত অবস্থায় বিগ্রহের সেবার জন্য. রহিয়াছে। কপালেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গের পরিবর্ত্তে পিতলের শিবমূর্ত্তি স্থাপিত। অতঃপর

আতুর সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থানে যাইয়া দেখিলাম, মৃত সন্ন্যাসীদের সন্তানরা স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দীপ দানে উজ্জ্বল করিতেছে। দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রথা আছে, প্রবীণ গৃহস্থ মোক্ষলাভের নিমিত্ত মৃত্যুকালে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহাদের মৃতদেহ এখানে সমাধিস্থ করা হয়।

পঞ্চবটী

পঞ্চবটী ঃ—বিশেষ আগ্রহের সহিত পঞ্চবটী পৌঁছিলাম। কিন্তু এখানকার দৃশ্য অকিঞ্চিৎকর। পাঁচটি বটবৃক্ষসমীপে একখানি ঘর, তাহাতে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। ভক্তগণের ধারণা শ্রীরামচন্দ্র যে রথে অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার শব্দ অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ফিরিবার পথে রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুইটি বৃহৎ গুহা আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানকার পবিত্র স্মৃতি লইয়া ত্র্যম্বকেশ্বর গমন করিলাম।

ত্র্যম্বকেশ্বর

ত্র্যম্বকেশ্বর ঃ—নাসিক হইতে দশ ক্রোশ দূরে গোদাবরী তীরে ত্র্যম্বক অবস্থিত। এ্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই বৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া এক প্রস্রবণের নিকটে অনেক বিগ্রহ দর্শন করিলাম। অতঃপর কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ডসমীপে মহামায়া দেবীর সম্মুখে বলিদান দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। ঐ গ্রামে প্রায় তিন

সহস্র লোকের বসতি। বিশেষ পর্ব্বদিনে দেবীর ভোগের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে এক মুষ্টি করিয়া চাউল সংগৃহীত হইয়া অন্ন তৈয়ার হয়। গরুর গাড়ীতে সেই অন্ন বোঝাই করিয়া প্রজ্বলিত মশাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ঐ গাড়ীসমেত অন্ন দেবীর ভোগে অর্পিত হয় এবং যূপকাষ্ঠে একটি নারিকেল ভগ্ন করা হয়। ইহাই দেবীর বলিদান। ঐ সময় বহু বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। দেবীর ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামবাসীরা কেহ আহার করে না। এই দৃশ্য দর্শনান্তে গন্তব্য স্থানে ফিরিয়া রাজপুতানা যাত্রা করিলাম।

জয়পুর

জয়পুর ঃ—প্রাতে জয়পুর নামিয়া ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় বিশ্রামান্তে বৈকালে গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনমানসে চলিলাম। নগরটি প্রাচীর বেষ্টিত। পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া সুবিস্তৃত রাজপথে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, এক প্রণালীতে গঠিত ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। রাজপ্রাসাদ অতি বৃহৎ; তাহার ভিতর অনেকগুলি পৃথক পৃথক অট্টালিকা আছে। গোবিন্দজীর মন্দির প্রাসাদের পুষ্পোদ্যানে অবস্থিত। এই গোবিন্দজী বৃন্দাবনের বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথা হইতে জয়পুরের রাজা ঔরংজেবের ভয়ে বিগ্রহ এখানে আনয়ন করেন। মূর্ত্তি অতীব সুন্দর, যত দেখা যায় ততই যেন দর্শন বাসনা জাগে। এখানে পূজারী বাঙ্গালী। তিনি আমাদের নবাগত দেখিয়া গোবিন্দজীর বাল্যভোগের মাখনমিছরি প্রসাদ দিয়া ধন্য

করিলেন। জয়পুরের প্রস্তরভাস্করশিল্প বিখ্যাত। দেবদেবীর চমৎকার মূর্ত্তি এখানে তৈয়ার হয়। এখানে পাঁচ দিন অবস্থানের পর আজমেড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আজমেড় ও পুষ্কর তীর্থ

আজমেড় ও পুষ্কর তীর্থ:—বৈকাল ৪টায় আজমেড় পৌঁছিয়া টাঙ্গাযোগে নবনির্ম্মিত বাঙ্গালী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। পরদিবস পুষ্কর রওনা হইলাম। সমতলভূমি শেষ হইলে পাহাড় কাটিয়া পথ গিয়াছে। এ জন্য কিছুটা পদব্রজে যাইতে হইল। এই দেশীয় পাহাড় ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মরুপ্রদেশে আসিয়াছি। পাহাড়গুলি বৃক্ষলতাহীন। যে সামান্য আগাছা জন্মে তাহাও পত্রবিহীন। গিরিবরের বর্ণও তদুপযোগী. যেন দগ্ধপ্রায়। আমরা পুষ্করের মানসরোবরের তীরে আসিলাম। এই সরোবরে বহু কুমীরের বাস। ইহার তীরে নানাদেশীয় রাজা ও বণিকগণ দেবালয় ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ স্থানের ব্রহ্মার মন্দির মহারাজ হোল্‌কার নির্ম্মাণ করেন। এখানে যাত্রীগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করান প্রথা আছে। মালপোয়া, পকৌড়ী, দইবড়া এ দেশীয় লোকের অতি উপাদেয় খাদ্য।

পুষ্কর হইতে কিছুটা দূরে সাবিত্রী পাহাড়। তদুপরি ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী রমণীদের নিকট সাবিত্রী দেবী বিশেষ পূজ্যা। প্রথা অনুযায়ী এ স্থানে সিন্দুর, নোয়া সাবিত্রী দেবীকে অর্পণ করিলে নাকি বৈধব্য

দশা ভোগ করিতে হয় না। এখান হইতে আজমেড় ফিরিয়া আবু পাহাড় অভিমুখে রওনা হইলাম।

আবু পাহাড়

আবু পাহাড় :—প্রাতে আবু ষ্টেশনে আসিলাম। পাহাড়ে উঠিবার জন্য ঝাপান প্রভৃতি পাওয়া যায় কিন্তু আমরা পদব্রজে উঠিলাম। আরাবল্লী পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অর্ব্বুদাচল। ইহার অপর নাম গুরুশিখর। পর্ব্বতের শোভা মন্দ নয়। এখানে বহুপ্রকার হিংস্র জন্তুর বাস। একটি নূতন ধরণের শ্বেতবৃক্ষ দেখা গেল। ক্রমে উচ্চে উঠিয়া আমরা এক মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলাম। মন্দির দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে মনে হইল যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মোচিত হইল। মন্দিরের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, যেন স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সাজ্জিত রহিয়াছে। দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হইল। মন্দিরের বাহির আড়ম্বরশূন্য। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় প্রহরী প্রত্যেকের জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া তবে প্রবেশ করিতে দেয়। ভিতরে দশটি কুঠরী। প্রত্যেক কুঠরীতে একটি বেদী, তাহাতে ধ্যানমগ্ন তীর্থশঙ্কর মূর্ত্তি। প্রতি চতুস্তম্ভের অন্তরালে কোথাও সমান, কোথাও খিলানের মত ছাত। সবই উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যখচিত। প্রত্যেক স্তম্ভ ও বেদীর আকার বিভিন্ন। গহ্বরের চতুর্দ্দিক খোদিত জৈন পৌরাণিক মূর্ত্তিতে পূর্ণ।

সায়ংকালে আরতি দর্শনের জন্য বিমল সাহের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তীর্থশঙ্কর ঋষভ দেবের অতি প্রকাণ্ড

অরুণবর্ণের প্রস্তরনির্ম্মিত ধ্যানস্থ মূর্ত্তি; দীপালোকে মণিময় কণ্ঠভূষণ উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান। এখান হইতে তেজপাল মন্দিরে আসিলাম। মন্দিরে শেষতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত নাতিদীর্ঘ মূর্ত্তি নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত॥

কথিত আছে, পূর্ব্বে এ স্থানে শিব ও বিষ্ণু মন্দির ছিল; পূজককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈনদের সহিত আলাপ করিয়া জানা গেল, তাহাদের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুইটি শ্রেণী আছে। শ্বেতাম্বর শ্রেণী নাকি বিলুপ্ত হইয়াছে। দিগম্বরশ্রেণী মহাপুরুষের মূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে কিন্তু বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে না, কারণ তাহাদের মতে ইহাতে বন্ধন রহিত হওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মিশ্রণে জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি। বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনরাও বেদ মানে না বলিয়া হিন্দুদের সহিত তাহাদের মতের মিল হয় না।

হিন্দুশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ হিন্দুরা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কখনও চিরনিয়ন্তা ভাবিতে পারে না। দেশ কাল পাত্র ভেদে সমাজ যখন যাহা শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছে। নানা ঋষি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহার সবগুলিই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। হিন্দু সমাজে থাকিয়াও কাহার যদি ইহলোক বা পরলোক সম্বন্ধে ভিন্ন মত থাকে কিন্তু হিন্দুসমাজের আচার মানিয়া চলে তবে সে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুসমাজ

ঈশ্বর-নাস্তিককে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু কর্ম্ম-নাস্তিককে গ্রহণ করে না। ঈশ্বর না মানিলেও চলে, সমাজ না মানিলে চলে না। সমাজ মানিলে বেদ মানিতে হয় এবং বেদ মানিলেই যে ঈশ্বরকেও মানা হয় তাহা অনেকেই বোঝে না।

আবু পর্ব্বতের নিকটস্থ একটি স্থানের ঘটনা

আবুর কয়েক ষ্টেশন পরে কিভালী হল্টে নামিয়া পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। সঙ্গে মহারাজ বাদে আর সকলেই আছে। তিনি সঙ্গে না থাকার কারণ তাঁহাকে না জানাইয়া নামিয়াছিলাম। এখানকার পাহাড়ীয়াদের আচার রীতি কিরূপ তাহা দেখাই এখানে নামার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ চড়াইউৎড়াই করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পথশ্রান্তিতে জলপিপাসায় সকলেরই কণ্ঠ প্রায় শুষ্ক। অদূরেই ছোট একটি গ্রাম দেখিতে পাইয়া যেন আশার সঞ্চার হইল। তথায় যাইয়া একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ঘরে কিছু সময় বিশ্রামান্তে তিনজন জলের অন্বেষণে বাহির হইলাম। অনেকটা দূরে যাইয়া জলকূপের সুরঙ্গপথের সন্ধান পাওয়া গেল। সুরঙ্গের মুখ হইতে জলকূপ প্রায় আধ মাইল দূর। বস্ত্রের দ্বারা কমণ্ডলুতে জল তুলিয়া নিজেরা পান করিয়া সঙ্গীদের জন্য লইয়া আসিলাম। সঙ্গীরা জলপান করিয়া সুস্থ হইল। অদূরে পাহাড়ী জংলীদের বাস। উহাদের খাবার দেখাইয়া মেলামেশার জন্য চেষ্টা করা হইলে তাহারা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল এবং আড়াল হইতে আমাদের দেখিতে লাগিল।

বেলা অনুমান ২টা, এমন সময় ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কতকগুলি লোক একসঙ্গে হইয়া চুপিচুপি কি যেন বলিতেছে ও কয়েকটি লোহার অস্ত্র ধার দিতেছে। নিকটে বড় বড় চারিটি লোহার কড়াই উনানের উপর চাপান আছে এবং কয়েকটা মহিষও সেখানে বাঁধা আছে। লোকগুলি আমাদের দেখামাত্র ক্ষিপ্রগতিতে জঙ্গলের ভিতর লুকাইল। উহাদের এই ভাবগতি দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহাদের মানুষের আকৃতি হইলেও প্রকৃতি রাক্ষসের ন্যায়। আর ক্ষণকালও এখানে থাকা উচিত নয় মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। দূর হইতে দেখিলাম, উহারা হাতে হাতে শিকলী বাঁধিয়া যাওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের যাইতে দেখিয়া অন্য লোকগুলি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বিপদের আশঙ্কায় সকলকে সচেতন হইতে বলিলাম—ভয়কে মনে প্রশ্রয় দিবে না। ভগবানকে ভরসা করিয়া আমার পিছনে আসিতে থাক। আমি যাইয়া একজনকে ঘুষি মারিলে তাহার হাত ছাড়িয়া যাইবে। তোমরা সেই সুযোগে পলাইবে। এই বলিয়া দ্রুতপদে উহাদের নিকটে যাইয়া একজনকে ঘুষি মারিতেই উহাদের হাত ছাড়িয়া গেল। ঐ সুযোগে সঙ্গীরা ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল। এদিকে গ্রামের জংলীগুলি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিলে আমি তখন নিরুপায় হইয়া একটি পাহাড়ে উঠিয়া আত্মরক্ষার জন্য ক্রমাগত পাথর ছুড়িতে লাগিলাম। দেখা গেল, উহারা

পাথর ছুড়িতে তত পটু নয়। উহারা তাই হটিয়া গেল। ইত্যবসরে আমি দ্রুতপদে আসিয়া সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি একখানি বগি সহ একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের এভাবে আসিতে দেখিয়া একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা এ অসময়ে কোথা হইতে আসিলেন? এই ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে বলাতে তিনি বলিলেন—আপনাদের মাতাপিতার নেহাত পুণ্যের জন্যই রাক্ষস জাতীয় জংলীদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন। ভদ্রলোককে এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে বলিলেন—ঐ পাহাড়ীরা পাহাড় হইতে মূল্যবান ধাতুর বিনিময়ে এখানে খাদ্যদ্রব্য লইতে আসে। এজন্য সকালবেলা কয়েকজন লোক আসিয়া সন্ধ্যায় পুনঃ চলিয়া যাই। একবার এই ঘরটিতে রাত্রে তিনজন কুলি ছিল কিন্তু সকালে আসিয়া তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সেই হইতে রাত্রে এখানে থাকিবার নিয়ম নাই। অতঃপর তাঁহার সঙ্গে আমরা আবুতে ফিরিয়া আসিলাম ও সেখান হইতে আমেদাবাদ রওনা হইলাম।

আমেদাবাদ

আমেদাবাদ :—আমাদের ট্রেণখানি সবরমতী সেতু অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে আমেদাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন সহরের দ্রষ্টব্য বিষয়সকল দেখিবার জন্য পদব্রজে বাহির

হইলাম। এখানকার বাড়ীগুলি প্রায়ই খোলার চালা। প্রত্যেকের মাথায় পাগ্ড়ী। প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া ভদ্রকালীর মন্দিরে যাইয়া দেবী দর্শন করিলাম। স্থানটি সমৃদ্ধিশালী। প্রাচীন মহত্বের অনেক চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এখানে যাত্রীদের পানীয় জল ক্রয় করিতে হয় এবং লোকেরা 'ব্রাহ্মণীয়া পানী' ও 'মুসলমানী পানী' হাঁকিয়া জল বিক্রয় করে। এখান হইতে বরোদা গমন করিলাম।

বরোদা

বরোদা ঃ—প্রাতে বরোদা পৌছিয়া সহরে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস। প্রধান রাজপথ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। যমুনা বাঈ এর চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বাটী জয়পুরের ন্যায় জালি দ্বারা গ্রথিত। বরোদার সুরসাগর প্রভৃতি দেখিবার মত বস্তু। এখানে দ্রব্য ক্রয় করার সময় মূল্য আদান প্রদানের জন্য কড়ি ব্যবহারের ন্যায় বাদাম ব্যবহৃত হইত। এদেশে যিনি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন তিনি পান্থনিবাসেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। মতিবাগ ও নজরবাগ প্রভৃতি দেখিয়া 'বেচারীজীর' মন্দিরে উপনীত হইলাম। মন্দিরে ভবানী দেবীর মূর্ত্তি হীরক অলঙ্কারে আপাদমস্তক ভূষিত। সেখানে তখন বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। গাইকোয়ার স্বয়ং অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নর্ত্তকীরা নৃত্যের সহিত মধুর সুরে হিন্দীতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান গাহিতেছে। এরূপ সুমিষ্ট কণ্ঠ-সঙ্গীতে দর্শক মাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

সুরাট

সুরাট ঃ—বেলা প্রায় ২টার ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে সুরাট পোত নির্ম্মাণের কেন্দ্র ছিল। তখন পারসিরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অদ্যাপি বোম্বাইর পোতাশ্রয়ে পারসিদেরই প্রাধান্য। এখানে 'কাঠি' নামক জাতির বাস ছিল বলিয়া ইহার নাম 'কাঠিয়াওয়ার' হইয়াছে। বন্দরটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত।

এখানে বল্লভাচারীদের শ্রীনাথজীর মন্দির এক বিচিত্র স্থান। সেখানে নাগরিক নরনারীর একাধারে সমাবেশ হয়। জনস্রোত অধিক বলিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলে সকলের একদ্বারে প্রবেশ করিয়া শ্রীনাথজীর দর্শন হউক কি না হউক, তজ্জন্য ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অন্য দ্বারে বাহির হইয়া আসিতে হয়।

সুরাট সহরের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়। 'ঘড়ি' নামক মিঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে ৩৫ তোলায় সের হয়। পুরুষ অপেক্ষা রমণীরাই বেশী পরিশ্রমী; ভারবহন বিক্রয়াদি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম তাহারাই অধিক করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। বরোদা হইতে বোম্বাই রওনা হইলাম।

বোম্বাই

বোম্বাই ঃ—প্রভাতের অরুণালোকে আমরা বোম্বাই ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ভারতের মধ্যে হাওড়া ষ্টেশন সর্ব্ববৃহৎ কিন্তু সৌন্দর্য্য হিসাবে বোম্বাই ষ্টেশন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাংলাদেশের ন্যায় এখানেও ফলমূল প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু মূল্য অধিক।

কেহ কেহ বলেন, 'বোম্বা' দেবীর নামানুসারে বোম্বাই নাম হইয়াছে। বোম্বাইর প্রধান দর্শনীয় স্থান 'হারবার'। ইহা ভারত সমুদ্রের খাঁড়ি। এক ঘাটে দাঁড়াইলে অপর ঘাট দেখা যায় না। প্রত্যেক ঘাটে বিভিন্ন দ্রব্য আমদানী হয়। 'প্রিন্সেস ডক' সর্ব্বপ্রধান; বহু জাহাজ ইহার ভিতর দাঁড়াইয়া মাল নামাইতে পারে। সন্ধ্যাকালে বায়ু সেবনার্থে পালা বন্দরের নাগরিকরা সেখানে সমবেত হয়। নিত্য তথায় 'ব্যাণ্ড' বাজিয়া থাকে। হারবারের একদিকে বোম্বাই সহর, অপরদিকে সাগরগর্ভে পর্ব্বতমালার মধ্যস্থলে 'কুচর', 'মপ', 'ছিনারটিকরী, প্রভৃতি জনশূন্য দ্বীপ। বোম্বাই সহরও এরূপ দ্বীপপুঞ্জের উপর অবস্থিত। সমুদ্রে মগ্ন গিরির উপর 'লাইট হাউস' স্থাপিত। ইহার চারিদিকে সাগরের তরঙ্গমালা লুটাইতেছে। অতঃপর আমরা দ্বারপুরী দেখিতে রওনা হইলাম।

শৈল বিদীর্ণ করিয়া অতি বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিগাত্রে বহুবিধ মনোহর ভাবময় বিগ্রহ খোদিত আছে; যথা—ত্রিমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরপার্ব্বতী, শিবের বিবাহ, গণেশজননী, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, দক্ষযজ্ঞ নাশ, মহাদেবের তপস্যা ও ভৈরব মূর্ত্তি। শিবের শিরোভূষণ দ্রাবিড় স্থাপতির কার্য্য বলিয়া মনে হয়, কারণ কোন্ সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এজন্য পাণ্ডাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। চৌপাট্টি ও পশ্চাৎদিগের খাঁড়ির সৈকত-

কূলে সন্ধ্যাবেলায় ভ্রমণ অতি মনোরম। সেখানে পূজারী ঘণ্টা বাজাইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, দ্বারা সাগরের অর্চ্চনা করিতেছে, ধর্ম্মপরায়ণ পারসিরা উপাসনা করিতেছে, আর নিম্নে অনন্ত সাগরের তরঙ্গমালা সগর্জ্জনে হেলিয়া তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। এই অপূর্ব্ব শোভা না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। বোম্বাই ২৩ দিন অবস্থানের পর গোমতী দ্বারকা যাত্রা করিলাম।

গোমতী দ্বারকা

গোমতী দ্বারকা ঃ—বোম্বাই হইতে কল্যাণ জংশন পর্য্যন্ত আমরা ট্রেনে আসিলাম। তখন দ্বারকা যাওয়ার তুইটি পথ ছিল ; এক বোম্বাই হইতে জাহাজে, দ্বিতীয় পদব্রজে। আমরা কল্যাণ হইতে অতি তুর্গম ৭০ মাইল পথ মালগাড়ীতে অতিক্রম করিলাম। এখান হইতে রেলপথ তখন সবেমাত্র পত্তন হইতেছে। রেল কেম্পানীর সাহায্যে আমরা এস্থান হইতে 'ট্রলিতে' আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাকী পথ পদব্রজে যাইয়া গোমতী দ্বারকায় পৌছিলাম। যতদূর দেখা যায় কেবল বালুকারাশি ধু ধূ করিতেছে।

গোমতী দ্বারকায় আসিবার পথের একটি ঘটনা

একদিন সন্ধ্যা আগত প্রায়, এমন সময় আমরা একটি গ্রামে আশ্রয় লইলাম। আমাদের দেখিতে পাইয়া বন হইতে কতকগুলি হরিণ ও ময়ুর আহারের লোভে নিকটে আসিল এবং

ময়ূরগুলি পেখম তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে আমরা কিছু ছোলাভাজা ছড়াইয়া দিলাম। একটি ময়ূর নির্ভয়ে আমার হাত হইতে ছোলা খাইতে থাকায় উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম। অতঃপর উহারা বনে চলিয়া গেল। আহারান্তে আমরা সকলে নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লইলাম। পূর্ব্বেই বোম্বাইতে শুনিয়াছিলাম দ্বারকার পথে 'কালমানুষের' ভয় আছে। তাহারা পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের কবলে পড়ি নাই।

রাত্রি যখন প্রায় ১টা তখন হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে একটি বিরাট চেহারার কালো লোক দাঁড়াইয়া আমরা ঘুমন্ত কি জাগ্রত তাহাই লক্ষ্য করিতেছে। এ অবস্থায় সবাইকে জাগান সঙ্গত নয় মনে করিয়া মহারাজকে ডাকিয়া বলিলাম—লণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিন, বাহিরে যাইব। মহারাজ তখনই উঠিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিলেন। তিনিও সশস্ত্র অবস্থায় ঐ লোকটিকে দেখিতে পাইলেন এবং ক্রমশঃ সঙ্গীরাও জাগিয়া গেল। লোকটিকে তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলাম—তুমি কেন দাঁড়াইয়া আছ, কি চাও? কোন উত্তর না পাইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—এই মুহূর্ত্তে চলিয়া যাও, নতুবা পুলিশে ধরাইয়া দিব। আমার এই ভাব দেখিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল এবং আরও কতকগুলি লোক ঐরূপ অস্ত্র লইয়া দরজার বাহিরে উপস্থিত হইল। উক্ত ঘরের লোকটি হল্লা শুনিয়া

নিজেই বাহিরে আসিল। তখন উহাদের সম্মুখে যাইয়া শান্তভাবে বলিলাম—আজ আমরা তোমাদের আশ্রিত। আশ্রিত ব্যক্তিকে মনে হয় বনের পশুরাও হত্যা করে না। যদি অর্থ চাও, সামান্য যাহা আছে দিয়া দিব; আমাদের মারিও না। এ কথা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি ছাড়া সবাই চলিয়া গেল। প্রথম ব্যক্তিকে তথাপি নির্ব্বাক দেখিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—নীরব আছ কেন? উত্তরে সে বলিল—আসিয়াছিলাম আপনাদের হত্যা করিয়া টাকাকড়ি লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু আপনাদের দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেলাম। তাই চলিয়া যাওয়া দূরের কথা, কথা বলারও শক্তি ছিল না। তখন বাকী রাতটুকু তাহার সহিত কথায় কাটান গেল। তাহার জংলী ভাষা কিছু কিছু বুঝিয়াছিলাম। প্রভাতে উক্ত লোকটি সহ তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গোমতী দ্বারকা রওনা হইয়াছিলাম।

গোমতী দ্বারকা তিনদিকেই সাগরবেষ্টিত। সাগরের একটি ধারার নাম গোমতী, মধ্যস্থলে দ্বারকাপুরী অবস্থিত গোমতী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে প্রস্তর বাঁধান সোপানাবলী। এ স্থানটি যাত্রীদের স্নান ও দানের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে স্নান করিতে হইলে বরোদার রাজষ্টেটে পাঁচসিকা জমা দিয়া স্নানের ছাড়পত্র লইতে হয়। এই ছাড়পত্র অফিসে দেখাইলে কর্ম্মচারী কালি দ্বারা অথবা ছাপ পোড়াইয়া বাহুতে চিহ্ন দিয়া দেয়।

স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও মোটামুটি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি

পাওয়া যায়। সমুদ্রের গর্জ্জনের জন্য কেহ কাহারও নিকটস্থ না হইলে কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরচূড়ার স্বুবর্ণ কলসী শীর্ষে বৃহৎ ধ্বজাটি বহু দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। দিগন্তের মাঝে স্বুবর্ণকলসীর উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া এমন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে যাহা পথশ্রান্ত যাত্রীর ক্লান্ত জীবনকে শান্ত করিয়া তোলে। মূলমন্দির অভ্যন্তরে উচ্চ বেদীর উপর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে যাত্রীদের জাতিনির্ব্বিশেষে বিগ্রহকে স্পর্শ ও পূজা করিতে দেওয়া হয়। সমস্ত দক্ষিণভারত ভ্রমণের পর এখানে এরূপ পূজার অধিকার পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। দেবদর্শনান্তে দ্বারকার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করা হইল।

গোমতীর সঙ্গমস্থলে যাত্রীদের স্নান করিবার জন্য পুলিশের যে আইন আছে তাহা অমান্য করিয়া আমরা স্নানের জন্য নামিলাম। এমন সময় পুলিশ আসিয়া আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। আমাদিগকে থানায় লইয়া যাইতে কৃতকার্য্য না হইয়া আমাদের তীরস্থ বস্ত্রগুলি লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। আমি তখন বলপূর্ব্বক তাহার হাত হইতে কাপড়গুলি কাড়িয়া লওয়াতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উপরস্থ কর্ম্মচারীকে খবর দিতে গেল। আমিও উত্তেজিত হইয়া পুলিশের এরূপ রূঢ় ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য থানায় চলিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে কুণ্ডলী বেষ্টন দ্বারা কয়েকটি ধনী ব্যক্তি সাধু, মহাত্মাদের সহ বার বৎসর যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন। আমি অন্যমনস্কভাবে ঐ

কুণ্ডলীর মধ্যে যাইয়া পড়িলাম। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণরা হঠাৎ 'যজ্ঞ পণ্ড হইল' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি ইহাতে বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। ব্রাহ্মণদের চিৎকারে যজ্ঞস্থলে বহু লোকের ভীড় জমিয়া গেল এবং ইত্যবসরে ঘটনাস্থলে উপরস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীও আসিয়া উপস্থিত হইল। যজ্ঞস্থলে একটি মহাত্মা ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি ঐ কলরব শুনিয়া ধ্যানভঙ্গে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অন্যান্য সাধুদের যজ্ঞারম্ভের সন ও তারিখ লিখিত কাগজখানি দেখিতে বলিলেন। তাহা দেখিয়া বলিলেন যে, সেদিনই বার বৎসর পূর্ণ হইল। তখন ঐ মহাত্মা বলিলেন—এখনই পূর্ণাহুতি দেওয়া হোক! পূর্ণাহুতি সমাপ্তের পর তাহারা এ শরীরের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। এ সব ব্যাপার দেখিয়া উপরস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী ও পূর্ব্বোক্ত পুলিশটি বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং আমাদিগকে বাকী কয়দিন গোমতী সঙ্গমে বিনা পয়সায় স্নানের অবাধ অধিকার দিলেন। এখান হইতে ভেট্‌দ্বারকা অভিমুখে রওনা হইলাম।

ভেটদ্বারকা

ভেটদ্বারকা ঃ—ভেটদ্বারকায় ষ্টীমার অথবা বাহাদুরী কাঠের নৌকাযোগে যাইতে হয়। আমরা নৌকায় দ্বারকাপুরী যাত্রা করিলাম। নৌকাখানি যখন মাঝসমুদ্রে পৌঁছিল তখন ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গে উঠানামা করাতে যাত্রীরা ভীত হইয়া 'হা দ্বারকানাথ!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এই কাতরধ্বনি

শুনিতে শুনিতে ভেটদ্বারকার সমুদ্রতটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহা সমুদ্রতীরস্থ একটি দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। ইহার মধ্যস্থলে ৺দ্বারকানাথের মন্দির অবস্থিত। এখানকার জল লবণাক্ত বলিয়া পানীয় জল অন্যত্র হইতে সরবরাহ করিতে হয়। দ্বীপবাসীরা অধিকাংশই পাণ্ডা। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। এখানে গরুগুলি ঘাসের অভাবে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। বৃক্ষাদির মধ্যে দু'চারটি মাত্র নারিকেল বৃক্ষ। ফলের মধ্যে খেজুরই প্রচুর ও সস্তা। এখানে সমুদ্রে বান ডাকা ব্যাপারটি একটি দ্রষ্টব্য বিষয়। বান ডাকিবার পূর্ব্বে জল প্রায় এক মাইল সমুদ্রগর্ভে আকর্ষিত হয়। তখন নানাপ্রকার অদ্ভুত জলজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। বান আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গরুগুলি লেজ উর্দ্ধে তুলিয়া দ্রুতগতিতে সহরাভিমুখে ছুটিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সতর্ক না হইলে বিপদে পড়িতে হয়। বান আসিলে জল প্রবল বেগে শো শো শব্দে এক মাইল পর্য্যন্ত তীরভূমি প্লাবিত করে।

এখানের মন্দির অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় নহে। ইহা সাধারণ কোঠাবাড়ীর ন্যায় ইষ্টক নির্ম্মিত। মন্দিরের ভিত্তি দ্বিতল সমান উচ্চ ও চূড়ায় সোনার কলসীর উপর পতাকা উড্ডীয়মান। অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের প্রধান দ্বারে উপনীত হইলাম। বিগ্রহ দর্শন করিতে হইলে আঠার আনা দিয়া ছাপ নিতে হয়। বিগ্রহ চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, শিরে তাজ; রাজবেশে দণ্ডায়মান। একশত আট কলসী দুগ্ধ দ্বারা দ্বারকানাথের অভিষেক হয়। তিনবেলা তিনপ্রকার

শৃঙ্গারবেশ হয়। প্রাতে নহবৎ বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সেই সময় রাখালবেশ ও বাল্যভোগ, দ্বিপ্রহরে রাজবেশ ও রাজভোগ ও সন্ধ্যায় সমস্ত শ্বেত আভরণে ভূষিত করিয়া আরতি ভোগ হয়। ভোগের অন্নপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে।

মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ঘর আছে। ভিতর প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে বসুদেব, দেবকী, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষীগণের চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহার অদূরে বৈকুণ্ঠ নামে একটি দ্বিতল গৃহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার কার্যাবলীর নিদর্শন সকল অদ্যাপি রক্ষিত আছে। এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কল্পবৃক্ষ নামে একটি বৃক্ষ আছে। প্রবাদ এই বৃক্ষ পূর্ব্বে বৃন্দাবনে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় আসিয়া রাজা হইলেন তখন ঐ বৃক্ষকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। ইহার তলে বসিয়া যে যাহা কল্পনা করে তাহাই সিদ্ধ হয়। ইহা এক বিচিত্র ধরণের। ইহার শাখা প্রশাখা পল্লবাদি দৃষ্ট হয়না ও ত্বক মনুষ্য ত্বকের ন্যায় কোমল। এখান হইতে আমরা প্রভাস অভিমুখে চলিলাম।

প্রভাস তীর্থ

প্রভাস তীর্থ ঃ—বাহাদুরী কাঠের নৌকাযোগে সাগর বক্ষে যাত্রা করিলাম। সাগরের তরঙ্গে কখনও বা দ্বিতল সমান উর্দ্ধে, কখনও বা জলের মধ্যে ওঠানামা করিতে করিতে

তিন দিনে সরাই নামক এক গ্রামে পৌঁছিয়া পান্থশালায় আশ্রয় লইলাম। সেখানে দানছত্র ছিল বলিয়া আহারাদির বিশেষ অসুবিধা নাই। গ্রামটি ছোট হইলেও কয়েকটি দোকান আছে। তাহাতে চাল, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। দেশটি যে অতি দরিদ্র তাহা দৃশ্য দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায়। গ্রামের সীমান্তে ছোট একটি রেল ষ্টেশন আছে।

এই গ্রামের একটি ঘটনা

এখানকার এক ব্রাহ্মণ আমাদের সকলকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রখর রৌদ্রতাপের জন্য দ্বিপ্রহরে না যাইয়া বৈকালে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া হইল। ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইয়া দেখি একখানি ভগ্ন পর্ণকুটীরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা আপন মনে চরকায় সুতা কাটিতেছেন ও তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে কোলে লইয়া হাসিমুখে বসিয়া আছেন। আমরা যাওয়া মাত্র তিনি সসব্যস্তে শিশুটিকে বাহিরে খাটিয়ায় শোয়াইয়া অতি সমাদরে বসিতে আসন দিলেন। কিছুক্ষন পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া স্ত্রীর নিকট কি যেন বলিলেন ও দুইজনে হাতদ্বারা চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণপত্নী উত্তরে বলিলেন—মাইজী! আমরা বড়ই ভাগ্যহীন। আপনাদিগকে ভোজন করিতে বলিয়া আজ আর ভিক্ষা মিলিল না। এ দুঃখেই কাঁদিতেছি। মহারাজ তখন অতিথি সৎকারের জন্য ব্রাহ্মণের হাতে দশটি টাকা দিলেন। ব্রাহ্মণী ইহাতে এত সন্তুষ্ট হইলেন যে দশখানি সোনার মোহর

পাইলেও বোধ হয় লোকে এত সন্তুষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ উহা দ্বারা বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিলে ব্রাহ্মণী সেই জিনিষপত্র লইয়া আনন্দে রান্নাঘরে ঢুকিলেন এবং এতগুলি লোকের রুটি ও আমসী দ্বারা আলুর তরকারী রান্না করিয়া যত্নসহকারে আমাদের ভোজন করাইলেন। এই অকিঞ্চিৎকর আহারে যতটা তৃপ্ত হইয়াছিলাম বোধ হয় রাজভোগেও ততটা তৃপ্ত হওয়া যায় না। আহারাদির পর ব্রাহ্মণীকে তাহার শিশুটি কোথায় জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে বলিলেন—আপনারা অতিথি, নারায়ণস্বরূপ। স্থানাভাবে আপনাদের অসুবিধা হইবে, এজন্য গোয়াল ঘরে উহাকে রাখিয়াছি। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম, ইহারা অতি সাত্ত্বিকভাবে অতিথি সেবা করেন। স্থানীয় স্ত্রীলোকগণ একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করেন না; পতিই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান ও উপাস্য দেবতা। রাত এগারটায় আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। পরদিবস ট্রেণযোগে প্রভাসে পৌঁছিলাম। এই ষ্টেশন হইতে প্রভাস তীর্থ ৪ মাইল। এ পথে ঘোড়ার ট্রাম ও এক্কায় যাতায়াত করা যায়। ষ্টেশন হইতে সোজা রাস্তা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল মোগল পাঠানদের কবরস্থান। সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—এমন সময় সমুদ্রের নিকটে এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বৃহৎ ধর্ম্মশালা কিন্তু যাত্রীর সমাগম নাই। একটি দ্বারোয়ান কেবল পাহারায় নিযুক্ত থাকে। আশেপাশেও কোন লোকের বসতি নাই। সমুদ্রের গর্জ্জন ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না।

প্রাতে সমুদ্র স্নান ও প্রভাসের কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সাগরে মিলিত হইয়াছে। বসুদেব এখানেই দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; ইহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। সে সময় যদু বংশের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় বংশ ধ্বংস হয়। শ্রীকৃষ্ণ তখন বিমর্ষ হইয়া অনতিদূরে এক নিম্ববৃক্ষের উপর বসিয়া এ বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। এক ব্যাধ ঐ সময়ে সে পথে শিকারে যাইতেছিল। বৃক্ষশাখায় শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণকে পক্ষী ভ্রমে সে বাণ নিক্ষেপ করিল। চরণে বাণ বিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রণায় অধীর হইলে তাঁহাকে যেখানে শুশ্রূষা করা হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন আসিয়া যে সঙ্গমস্থলে তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করিয়াছিলেন সে স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান। সেখানে যাত্রীরা পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি ও পুণ্যলাভের আশায় পুষ্পমাল্য দান করিয়া থাকে। প্রভাস তীর্থের পরিসর চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপী। এখান হইতে সোমনাথ দর্শনে চলিলাম।

সোমনাথের মন্দির অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে ইহা যে একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, ভগ্নাবশেষই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ শিবলিঙ্গ। প্রভাসে ও সোমনাথে যাহা কিছু দেখিলাম তাহা সমস্তই ম্লান ও বিষাদের স্মৃতিচিহ্ন।

প্রভাস তীর্থের একটি ঘটনা নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

প্রভাসে যে ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম সেখানে শান্তির

পরিবর্ত্তে কেমন যেন একটি আতঙ্কের ভাব আসিল। অনেকগুলি ঘরের মধ্যে ৪।৫ খানি ঘর লইয়া আমরা রহিলাম। এক সন্ন্যাসী সন্ধ্যার পর শৌচকার্য্যের জন্য বাহিরে গেলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার অস্ফুট চিৎকার শুনিতে পাইয়া হাটিয়া গেলাম। সন্ন্যাসীর নিকট যাইতেই অদূরে আঙ্গুল দেখাইয়া তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিলাম, একটি বিরাট ছায়ামূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। লক্ষ্য করিবামাত্রই ছায়াটি অদৃশ্য হইয়া গেল। অতঃপর রাত্রে শয়নের কিছুক্ষণ পরেই মহারাজের চিৎকার শুনিয়া তাঁহার ঘরে যাইয়া দেখি, একটি কুকুরের ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলাইয়া গেল। যাহা হউক, পুনরায় সকলে শয়ন করিতে গেলাম। গভীর রাত্রে পুনঃ অপর এক সঙ্গীর চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার নিকট যাইয়া দেখি, একটি মানুষের কালোছায়া তাহার শয্যার চারিদিকে যেন পায়চারি করিতেছে। নিকটে যাওয়া মাত্র ছায়াটি অদৃশ্য হইয়া গেল। এইপ্রকারে সারারাত্রি প্রেতের উপদ্রবের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। পরদিন গীর্ণার পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করা হইল।

গীর্ণার পর্ব্বত

গীর্ণার পর্ব্বত :—বেলা যখন দ্বিপ্রহর তখন গীর্ণার ষ্টেশনে আমাদের গাড়ীখানি আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বযানে সহরে গমন করিলাম। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ধুলাময়। রাস্তার দুই পার্শ্বে অধিকাংশই

চালা ঘর; মাঝে মাঝে অট্টালিকা দেখা যায়। সহরটি বিশেষ বড় নহে। প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। এক বৈষ্ণবের আখ্‌রায় জিনিষপত্র রাখিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। প্রায় সতের শত সিড়ি অতিক্রম করিতে হয়। সে সময় ধূয়ার মত পদার্থ গায়ের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া ধরিয়া দেখিবার কৌতূহল হইল। উহাতে হাত দেওয়ার ফলে নীচে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল ও তথাকার লোকগুলি ভিজিয়া গেল। ইহাতে পাহাড়ীরা উপরে উঠিয়া আমাদের র্ভৎসনা করিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, ঐ ধুয়াই মেঘখণ্ড এবং তাহা স্পর্শ করিবার ফলেই বৃষ্টি হইয়াছে। চড়াই উৎরাই করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া গোরক্ষ সম্প্রদায়ের আশ্রম সম্মুখে উপনীত হইলাম। ইহা পর্ব্বতের একটি শিখর; অপর শিখরে অবতার দত্তাত্রেয়ের সিদ্ধস্থান। গোরক্ষনাথজীর আশ্রমের নিকটে বিরাট প্রাচীর বেষ্টিত জৈন মন্দির অবস্থিত। আশ্রমের সম্মুখভাগে বহুকালের মোহান্তদের দেহত্যাগের চিহ্নস্বরূপ শিকল ও চিম্‌টা পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এ শিখর হইতে পার্ব্বতীয় রাস্তাটি ঝোলার ন্যায় ঢালু হইয়া অপর শিখরদেশে যাইয়া উঠিয়াছে। এ স্থানে বিশ্রাম ও আহারান্তে অপর শিখরে রওনা হইলাম। পথে সমতল ভূমিতে ভদ্রকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে নানা ফলফুলের উদ্যান ও সরোবর থাকায় স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দত্তাত্রেয়ের সিদ্ধস্থানে পৌঁছিলাম। সম্মুখে

জগৎগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত পাতুকা প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি তুই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন অবলোকন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ হইল। শিখর হইতে সহরের দৃশ্য ছোট ছবির মত দৃষ্ট হইতেছিল। স্থানটি অতি নির্জ্জন; সত্যই তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পার্ব্বতীয় আবহাওয়া এমনই বিশুদ্ধ যে তাহা স্বভাবতঃই মানুষের মনকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। সূর্য্যদেবকে সন্ধ্যার কোলে মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া কি উপায়ে নিম্নে নামা যাইবে ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় দত্তাত্রেয়ের একটি সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুর সঙ্গে কিছুদূর নামিয়া আসিলাম। এখানে সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানা গেল, তখন রাত ৯টা। ইহাতে সাধুটি বলিলেন—আপনারা এ রাত্র আমাদের আশ্রমে আসিয়া থাকুন। অতি আনন্দে সেই আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলাম। বেলা যখন অনুমান ৮টা তখনও চারিদিক কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন। এজন্য সাধুদের মধ্যে একজন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছুটা দূর পৌঁছাইয়া দিলেন। পার্ব্বতীয় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ৪ টায় পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিলাম। পরদিবস পুণা যাত্রা করিলাম।

পুণা

পুণা :—যথাসময়ে পুণা ষ্টেশনে নামিয়া অশ্বযানে যাইয়া এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। প্রথমে পর্ব্বতোপরি পার্ব্বতী দেবীর মন্দির দর্শনান্তে 'মুলামুদা' নদীতীরস্থ বন্দ উদ্যানে

উপস্থিত হইলাম। এই উদ্যানটি উপবন। নরনারীরা এখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসিয়া থাকে। একটি প্রস্রবণ হইতে ছত্রাকারে বারিধারা উত্থিত হইতেছে। বন্দ্ জলপ্রপাত দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার অজস্র জলরাশি অতি বেগে পতিত হইয়া বাঁধনহারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এখানে পাহাড়ের উপর চতুঃশৃঙ্গি দেবীর মন্দির অবস্থিত। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেবীর গলদেশ 'তাম্বল বল্লীর' মালা। ইহা 'বীরাচারীদের' স্থান। অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা দেবীর ভোগ ও পর্ব্বতের নিম্নে চত্বরে বলিদান হয়। প্রাতে মৃদঙ্গ ও বীণাবাদ্য সহযোগে নারায়ণের সম্মুখে স্তুতি ও গীতাপাঠ হয়। একাদশী তিথির অপরাহ্নে এখানে বিপুল জনতার সমাগম হইয়া থাকে।

তুলসীবাগ পুণার প্রধান দেবালয়। মন্দিরের আকার সিংহাসনের ন্যায়। মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ প্রত্যহ মন্দিরের সমুদয় প্রকোষ্ঠে আল্‌পনা দেওয়া হয়। মূলমন্দিরে রাম, লক্ষণ ও সীতাদেবী বিরাজমান এবং তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পোষাকে ভূষিত। এ স্থান ও বাঁধ সন্নিহিত উদ্যান এখানকার ভ্রমণের একটি বিশিষ্ট স্থান। বোম্বাই অপেক্ষা পুণার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এ দেশের প্রায় লোকেরই মস্তক মুণ্ডিত, দীর্ঘ শিখা ও গলদেশে উত্তরীয়। স্ত্রীলোকগণ কাছাকোছা দিয়া রঙ্গীন শাড়ী পরিধান করে। এখানে অবরোধ প্রথা না থাকায় কুলবতীরা অবাধে চলাফেরা করে। সহরে ফার্গুসন কলেজের নিকট শৈলমালার কিছুদূরে পাণ্ডবগুহা প্রভৃতি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে,

ঐ গুহায় পাণ্ডবগণ বনবাসকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। পুণা হইতে আমরা রায়চুর, শোলাপুর প্রভৃতি দেখিয়া জুনাগড় হইয়া বদরিকাশ্রম দর্শন মানসে হরিদ্বার যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার

হরিদ্বার ঃ—হরিদ্বার অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। হিমালয় হইতে অলকানন্দা অবতরণ করিয়া এ স্থানে জাহ্নবী নামে প্রবাহিতা। এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর পূর্ণ কুম্ভমেলা হয়। এ সময়ে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সাধু, সন্ন্যাসীগণ এখানে মিলিত হন। সমাগত যাত্রীরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শিবগিরি প্রদক্ষিণ, কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিণ্ডদান এবং ভিমগরা, সপ্তস্রোতা, জ্ঞানগিরি, সর্ব্বনাথ শিব, সূর্য্যকুণ্ড, বিল্বকেশ্বর শিব, মায়াদেবী ভৈরবনাথ, চণ্ডীদেবী, চণ্ডীপাহাড় ও নীলধারা দর্শন করিয়া থাকে। এখানে সাধুদের অনেক মঠ আছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী ভোলানন্দ গিরির আশ্রম ও ধর্ম্মশালা। এই ধর্ম্মশালায়ই আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। অনতিদূরে ত্রিলোকেশ্বর শিব মন্দির। স্থানটি অতি নির্জ্জন বলিয়া সাধনার অনুকূল। ষ্টেশন হইতে দক্ষিণে মায়াপুরে ঋষিকুল ব্রহ্মচারিদিগের আশ্রম আছে। এ যুগে এরূপ আশ্রম বিরল। আশ্রমের শিক্ষাপ্রণালী বেদসম্মত। ব্রহ্মচারী বালকদিগকে দেখিলে পুরাকালের আর্য্যঋষিদিগের কথা স্মরণ পথে উদিত হয়।

প্রবাদ—পুরাকালে এখানে দক্ষরাজার রাজধানী ছিল এবং

রাজা এখানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড, দক্ষেশ্বর প্রজাপতি শিব ও সীতাকুণ্ড প্রভৃতি বিদ্যমান। সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার জন্য কয়েকটি অন্নছত্র আছে। এখানকার রামকৃষ্ণমিশনের সেবাশ্রম সর্ব্বজনপ্রশংসিত। ধনা মারোয়াড়ীদের নির্ম্মিত কতকগুলি ধর্ম্মশালা ও গরীব ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বর্ষার সময় ঋষিকেশে জ্বর আরম্ভ হইলে সন্ন্যাসীরা এখানে আসিয়া ৩।৪ মাস অবস্থান করেন ও এখানকার অন্নছত্রে ভিক্ষা পাইয়া থাকেন।

বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথ হইতে পাণ্ডাজীরা যাত্রী সংগ্রহের জন্য হরিদ্বার পর্য্যন্ত আসেন এবং যাত্রীদের বদরিনারায়ণ যাতায়াতের পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে থাকেন। ইহাতে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হয়। হরিদ্বার হইতে আমরা ট্রেনযোগে ঋষিকেশ রোডে নামিয়া এক মাইল দূরে যাইয়া সত্যনারায়ণজীর মন্দির দর্শন করিলাম। বিগ্রহ মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত ও পাশে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। এখানে প্রত্যহ সাধুদের জন্য সদাব্রত এবং একটি ধর্ম্মশালায় দোকান ও জলের সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে আহারাদি শেষ করিয়া পদব্রজে বৈকালে ঋষিকেশে কালীকম্বলীবাবার ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

ঋষিকেশ

ঋষিকেশ :—স্থানটি তিনদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ হইতে অলকানন্দা ত্রিধারায় প্রবাহিতা হইয়া

দক্ষিণ পশ্চিমে পুনরায় একত্রিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থলের নাম ত্রিবেণী। ইহা স্নানের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা তপস্যা করেন এবং সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বৈকালে সমবেত ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ বিষয় শ্রবণের সুবিধা হয়। এখানে ভরতজীর মন্দির, কুব্জা কুণ্ড, নারায়ণজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। এখানেও যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা ও সন্ন্যাসীদের জন্য অন্নছত্র আছে। এই সকল ছত্রে সন্ন্যাসীদিগকে বহির্বাস, কৌপীন, কমণ্ডলু প্রভৃতি প্রয়োজনায় দ্রব্য দেওয়া হয়। ভারতের আর কোথাও সাধুদের ভিক্ষার এরূপ সুব্যবস্থা নাই। পনের দিন ঋষিকেশে অবস্থানের পর তিন মাইল পরবর্ত্তী লছ্‌মনঝোলা রওনা হইলাম।

ঋষিকেশের একটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বলা হইল

ঋষিকেশে থাকাকালে একদিন অলকানন্দায় স্নান করিতে গেলাম, কিন্তু যে ঘাটে সাধু, সন্ন্যাসীরা স্নান করে, সেই ঘাট খালি না থাকায় নিকটবর্ত্তী এক স্থানে জলে নামিলাম। সাধারণতঃ কেহ এখানে স্নান করে না এবং জলের গভীরতাও বেশী। আপন মনে স্নান করিতেছি, এমন সময় মনে হইল, কে যেন জলের মধ্য হইতে আমার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে। সন্ন্যাসীদের চিৎকার শুনিয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখি, একটি

প্রকাণ্ড বিচিত্র রঙের মকর জলের মধ্য হইতে শুঁড় দিয়া খেলার ছলে আমার কাপড় টানিতেছে এবং মাঝে মাঝে জল লইয়া আমার শিরে বর্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভাবিলাম, ৺গঙ্গাদেবীর বাহন যখন আসিয়াছে তখনও দেবীও নিশ্চয় স্বয়ং বিরাজমান। ইহা ভাবিয়া ৺গঙ্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য তীরে ভীড় জমিয়া গেল এবং সমবেত কণ্ঠের 'গঙ্গা মাই কি জয়!' ধ্বনি, স্তব ও সাধুদের বেদগানে নদীতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মকরটি অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর হইতে সাধুরা অনেকেই এখানে স্নান করিতে লাগিলেন।

লছ্‌মনঝোলা

লছমনঝোলা ঃ—এ স্থান সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণদেব এখানে গঙ্গা পার হইবার জন্য পর্ব্বতের মধ্যদেশে দুইটি দড়া ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীসুরজমল তাহার স্বর্গগত মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে লৌহসেতু প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা। ইহার উভয়তীরে পর্ব্বতগাত্রে সন্ন্যাসীদের কুটির অবস্থিত। স্বর্গাশ্রমে সন্ন্যাসীদের জন্য অন্নছত্র এবং যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা ও চটী আছে। চটীওয়ালার দোকানে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে অনেক গুহায় সন্ন্যাসীরা তপস্যায় রত। এখান হইতে ফুলবাড়ী চটীর পথে অগ্রসর হইলাম।

ফুলবাড়ী চটী

ফুলবাড়ী চটী :—লছ্‌মনঝোলা হইতে ফুলবাড়ী চারি মাইল। সন্ধ্যায় আমরা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশ বহিয়া কলকলনাদে গঙ্গা প্রবাহিতা। ইহার নিকটেই এই চটী অবস্থিত। আহারাদির পর রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে দুই মাইল পর মোহন চটী। এখানে 'হিউলী' নদীর উপর লৌহনির্ম্মিত সেতু পার হইয়া দক্ষিণতীরস্থ একটি জলচাকীতে গম হইতে আটা প্রস্তুত হইতে দেখা গেল। এখানে কালীকম্বলীর দানছত্র ও দোকান আছে। এখান হইতেই পর্ব্বতের চড়াই আরম্ভ হইল। এই চড়াই অতিক্রম করিয়া ছোট বিজলী চটীতে যাইয়া পৌঁছিলাম। প্রথমেই চড়াই অতিক্রম করায় ক্লান্ত বোধ করিতে লাগিলাম। এই চটীতে ছত্র, ডাকঘর দোকান প্রভৃতি আছে। আহার ও বিশ্রামের পর বড় বিজলী চটী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

বড় বিজলী চটী

বড় বিজলী চটী :—সন্ধ্যার সময় এ চটীতে আসিলাম। এখানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা নীরবে প্রবাহিত হইতেছে। উপরে পর্ব্বত গাত্রে বিজলী গ্রামের দৃশ্য দেখা যায়। ইহার নিম্নদেশে গঙ্গা একটি শীর্ণ শুভ্র রেখার ন্যায় প্রবাহিতা। এখানে রাত্রিবাস কবিয়া 'প্রাতে পুনরায় চলিতে লাগিলাম এবং দ্বিপ্রহরে কুণ্ডচটীতে যাইয়া পৌঁছিলাম।

কুণ্ডচটী

কুণ্ডচটী ঃ—এখানে ৩।৪ খানি ঘর আছে। খানিকটা নীচে একটি ঝর্ণা ; তাহার জল খুব সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। এখান হইতে প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাঁদর চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্থানটিতে একটি সাধুর পর্ণ কুটীর ও স্বচ্ছ সলিলা ঝর্ণা রহিয়াছে। ইহার জল পান করিয়া আরও দুই মাইল চলার পর মহাদেবচটী পাইলাম।

মহাদেবচটী

মহাদেবচটী ঃ—এখানে পৌঁছিয়া বিশ্রামান্তে স্নানাদি সমাপ্ত করিলাম। এখানে মহাদেবের মন্দির আছে। তাঁহার দর্শন ও পূজা করিয়া চটীতে ফিরিয়া আহারাদি শেষ করা হইল। এখানে কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালার নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। এস্থান হইতে রাম চটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

রামচটী

রামচটী ঃ—ইত্যপর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত। পর্ব্বত গাত্র বহিয়া পরিষ্কার ঝর্ণার জল প্রবাহিত। দূরের গ্রামগুলি ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে। পাহাড়ী বালক বালিকারা "পরমাত্মার জয় হউক !" বলিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছে। রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে কান্তি চটীতে অগ্রসর হইলাম।

কান্তিচটী

কান্তিচটী ঃ—এ স্থানের উপর ও নীচের দৃশ্য অতি চমৎকার। পথের উভয়পার্শ্বে আম্রকানন ও বসিবার স্থান আছে। এখানে একটি গোপালজীর মন্দির অবস্থিত। ইহার নিকটেই ঔষধালয়, ধর্ম্মশালা ও ঝর্ণা আছে। এখান হইতে এক মাইল উৎড়াই এর পর ব্যাসগঙ্গার উপর লৌহনির্ম্মিত সেতু পার হইলে একটি রাস্তা ব্যাসঘাট হইয়া দেবপ্রয়াগ এবং অপরটি নিজামবাদ অভিমুখে গিয়াছে। এই রাস্তায় বহু মালপত্র হিমালয় প্রদেশে আমদানী হইয়া থাকে। এই সেতুর নিকটেই ব্যাসঘাট চটী এবং কিছুদূরে ব্যাসগঙ্গা। চটীতে মহর্ষি বেদব্যাসের মূর্ত্তি এবং কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর কিছুসময় বিশ্রাম লইয়া গঙ্গাতীর ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গৌরচটীতে পৌঁছিলাম।

সৌরচটী

সৌরচটী ঃ—এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর। দেবপ্রয়াগ হইতে পাণ্ডারা আসিয়া এখানে যাত্রী সংগ্রহ করে। চটীর দোকানে চাল, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। দোকান হইতে জিনিষ ক্রয় করিলে রান্নার সরঞ্জামও দেয়। পরদিন কিছুদূর অগ্রসর হইলে দূর হইতে দেবপ্রয়াগের মনোহর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। পর্ব্বতের উপর স্তরে স্তরে সহরের বাড়ীগুলি দূর হইতে এতই মনোমুগ্ধকর যে স্বর্গের দৃশ্য বলিয়া ভ্রম

হয়। গঙ্গার উপর লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া দেবপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম।

দেবপ্রয়াগ

দেবপ্রয়াগ ঃ—দেবপ্রয়াগ সত্যই যেন দেবতাদের মিলনক্ষেত্র। এখানে আসিয়া শরীরের ক্লান্তি ও মনের অবসাদ দূর হইয়া এক দিব্যভাবে যেন অন্তর ভরিয়া উঠিল। পথিপার্শ্বে ফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে সহর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সহরটি অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। এখানে বদরিকাশ্রম হইতে অলকানন্দা ও গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে পিণ্ডদান করিয়া বরাহ তীর্থ, সূর্য্য তীর্থ ও আদি বিশ্বেশ্বর, রঘুনাথজী, বশিষ্ঠ গুহা প্রভৃতি দর্শন করিলাম। অলকানন্দার পূর্ব্বতীরে টিহরী রাজ্য ও পশ্চিমতীরে ইংরেজ সরকারের রাজ্য ছিল। দেবপ্রয়াগ টিহরী রাজ্যের প্রধান সহর। অলকানন্দার উপর সেতুটি চমৎকার। এখানে সকলপ্রকার জিনিষের কতকগুলি দোকান, দাতব্য চিকিৎসালয়, কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। এখান হইতে দুইটি পথ বাহির হইয়াছে; একটি গঙ্গার ধার দিয়া টিহরী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও কেদার হইয়া বদরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে; অপরটি বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়াগ হইয়া বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কেদারনাথের পথ ইহাপেক্ষা দুর্গম। সন্ধ্যার সময় আরতির সম্ভার লইয়া গঙ্গাদেবীর আরতির পর পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। বদরিকা

যাওয়ার জন্য লাঠি ও পাদুকা এখানেই ক্রয় করিতে হয়, কারণ উপরে আর কোন স্থানে ইহা পাওয়া দুষ্কর। এখানকার গঙ্গার স্রোত অতি প্রবল বলিয়া সঙ্গমে লোহার শিকল ধরিয়া যাত্রীরা স্নান করে। দেবপ্রয়াগে তিন দিন অবস্থানের পর আবার পথ চলা আরম্ভ হইল। পথে দেখিলাম, রামছাগল ও খচ্চর মাল লইয়া উপরে উঠিতেছে। দুইটি চটী পার হইয়া বিল্বকেশ্বর চটীতে পৌঁছিলাম।

বিল্বকেশ্বরচটী

বিল্বকেশ্বরচটী ঃ—ইহার অপর নাম ঢুংঢং প্রয়াগ। এই নামে একটি নদী এখানে আসিয়া অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে একটি লৌহসেতু আছে। ইহার পার্শ্বে বিল্বকেশ্বর শিবালয় অবস্থিত। এখান হইতে একটি রাস্তা টিহরীর রাজধানী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া ভোরে শ্রীনগর রওনা হইলাম।

শ্রীনগর

শ্রীনগর ঃ—এই নগর এক সময়ে বৃটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিসকল এখনও বর্ত্তমান। সহরটি বেশ পরিষ্কার ও শ্রীসম্পন্ন। এখানে ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, কলেজ, স্কুল, সংস্কৃত পাঠাগার, দোকান, বাজার ও কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা আছে। কয়েকটি দেবমন্দির এবং শঙ্করনাথ ও কমলেশ্বর নামে দুইটি মঠও আছে। অন্য স্থান

অপেক্ষা এখানে জিনিষের মূল্য কিছু কম। প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে দুই দিন অবস্থানের পর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ভট্টিসেরাচটী

ভট্টিসেরাচটী :—শ্রীনগর হইতে আট মাইল দূরে এই চটী। এখানে দুই তিনখানি পাথরের দ্বিতল বাড়ী আছে। খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বৃষ্টির জন্য বাহির হইতে না পারায় একদিন এখানে থাকিয়া পরদিবস ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। দুই মাইল উৎড়াই করার পর খাখ্‌রা চটীতে পদার্পণ করিলাম। এখানে যথেষ্ট পরিমাণ ঘি ও দুধ সস্তায় পাওয়া যায়। এখান হইতে চড়াইউৎড়াইর পর গুলাবড়াই চটীতে বিশ্রামান্তে বেলা প্রায় একটায় রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছিলাম।

রুদ্রপ্রয়াগ

রুদ্রপ্রয়াগ :—অলকানন্দার উপর লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে হয়। ইহা অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। সঙ্গম তীরে কতকগুলি দেবমন্দির অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে শ্রীরুদ্রনাথ শিব, নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেব ও অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ—ভগবান শঙ্কর দেবর্ষি নারদকে এখানে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সঙ্গমে বাঁধান সিড়ি আছে। সেখানে পাণ্ডারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাত্রীদের স্নানাদি নির্ব্বাহ করান। এখানে কালীকম্বলীর

ধর্ম্মশালা, দোকান, ডাকঘর ইত্যাদি আছে। এ স্থান হইতে দুইটি রাস্তার মধ্যে একটি মন্দাকিনী ও অপরটি অলকানন্দার তীর ধরিয়া বদরিকায় গিয়াছে। আমরা অলকানন্দার তীরস্থ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। পথে শিবানন্দ ও কামড়া চটীতে বিশ্রামান্তে ছোট পিপ্পল চটীতে আসিলাম।

ছোট পিপ্পলচটী

ছোট পিপ্পলচটী ঃ—এখানে আসিতে অলকানন্দার উপর লৌহসেতু পার হইতে হয়। চটীতে খাদ্যদ্রব্য প্রায় সবই পাওয়া যায়। নিকটের একটি ঝর্ণার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। আহার ও বিশ্রামান্তে ক্রমশঃ উচুনিচু পথ অতিক্রম করিয়া কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছিলাম।

কর্ণপ্রয়াগ

কর্ণপ্রয়াগ ঃ—কর্ণগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে কর্ণপ্রয়াগ অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, এস্থানে দাতা কর্ণ একটি বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাই এ স্থানের নাম কর্ণপ্রয়াগ। উমাদেবীর মন্দির ও কর্ণকুণ্ড এখানকার প্রধান তীর্থ। এখানে ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও একটি পরিষ্কার জলের ঝর্ণা আছে। স্থানীয় পাহাড়ীরা অতি সরল ও আমোদপ্রিয়। এখানে একদিন অবস্থানের পর পুনরায় পথ ধরিলাম। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই এক একটি পর্ব্বতের এক এক প্রকার শক্তি অনুভব

করিলাম। আরও দুই তিনটি চটী অতিক্রম করিয়া সনোলা চটীতে পৌঁছিলাম।

সনোলা চটী

সনোলা চটী ঃ—অন্যান্য চটী হইতে এই চটী একটু উন্নত ধরণের বলিয়া মনে হইল। এখানে একটি ঝর্ণা ও ডাকবাংলা আছে। এই চটীতে আহার ও বিশ্রামান্তে নন্দার উপর লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া আট মাইল চলার পর নন্দপ্রয়াগ পৌঁছিলাম।

নন্দপ্রয়াগ

নন্দপ্রয়াগ ঃ—এখানে অলকানন্দা ও নন্দগঙ্গার সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমের উপরিভাগে দেবী চণ্ডিকা, নন্দ, যশোমতী, কৃষ্ণ, বলরাম, ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পর্ব্বতের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র নগরটি অতি রমণীয়। প্রাচীনকালে মহর্ষি কণ্বমুনি এখানে তপস্যা কয়িয়াছিলেন। এই জন্য ইহার অপর নাম কণ্বাশ্রম। এখানে স্থানে স্থানে অনেকগুলি ঝর্ণা আছে। একদিন অবস্থানের পর অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

লালসাঙ্গা বা চামুলী চটী

লালসাঙ্গা বা চামুলী চটী ঃ—এখানে আদালত, ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। এ স্থানের প্রায় ঘরগুলির

স্লেট পাথরের ছাউনি। এখানে অত্যন্ত বাঘের উপদ্রব। এইজন্য সন্ধ্যার পর পুলিশ আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীকে সতর্ক করিয়া দেয়। এখানে রাত্র যাপন করিয়া পরদিবস পুনঃ চলিতে লাগিলাম।

সিয়াহারা চটী

সিয়াহারা চটী ঃ—এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। রাস্তার পার্শ্বে ঝর্ণার জলধারা উপর হইতে নিম্নদেশে দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছে। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে চটী অবস্থিত। এখানে আহারান্তে দুই মাইল দূরে বিল্বেশ্বর শিবদর্শন করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইলে চড়াই আরম্ভ হয়। তারপর লৌহসেতু পার হইয়া সন্ধ্যায় যাইয়া পিপ্পল চটীতে পৌঁছিলাম।

পিপ্পলকোটি চটী

পিপ্পলকোটি চটী ঃ—এ স্থানটি পর্ব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অনেকগুলি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। পার্শ্বে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি নির্জ্জন ও সাধনোপযোগী। চারিদিকের পর্ব্বতগুলি যেন ধ্যানমগ্ন। কোন পশুপক্ষীরও সাড়া নাই। নিকটেই কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। প্রাতে এখান হইতে সোজা রাস্তায় কিছুটা পথ উৎড়াইর পর গরুড়গঙ্গা নামক চটিতে যাইয়া পৌছিলাম।

গরুড়গঙ্গা চটী

গরুড়গঙ্গা চটী ঃ—এখানে গরুড়গঙ্গা নদী প্রবাহিতা। যাত্রী মাত্রেই সর্পভয় নিবারণার্থে এ গঙ্গায় স্নান করিয়া থাকে। নদীতে ছোট পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়। এই নুড়ি সঙ্গে থাকিলে নাকি সর্পভয় থাকে না। তাই যাত্রীরা অনেকে তাহা সংগ্রহ করে। গঙ্গার তীরে গরুড়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে ধর্ম্মশালা ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। গরুড়গঙ্গার স্নানান্তে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে পর্ব্বতের উপর শাল, সেগুন বৃক্ষগুলি যেন নিশ্চল ও স্থির। কিছুক্ষণ চড়াই উৎড়াই করিবার পর পাতালগঙ্গা চটীতে পৌঁছিলাম। এখানে গণেশজীর মন্দির আছে। এখানকার জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। প্রায় আট মাইল অগ্রসর হইবার পর কুমহার চটীতে আসিলাম।

কুমহার চটী

কুমহার চটী ঃ—এখান হইতে একটি পার্বত্য পথ কালেশ্বর ও পঞ্চম কেদারনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার অদূরে কর্ম্ম-নাশা গঙ্গা প্রবাহিত। জন্মজন্মান্তরীণ সঞ্চিতকর্ম্মনাশের জন্য যাত্রীরা তথায় স্নান করিয়া থাকে। এখানকার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চারিদিকে পর্বতশিখরে শুভ্র তুষাররাশি উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া এক মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া শরীরের ক্লান্তি যেন আপনা হইতে অপসারিত হইল। এখানে ঝরণার জল বেশ পরিষ্কার। সেই জন্য

পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষে চারিমাইল অতিক্রমপূর্ব্বক উদাস চটী হইয়া সিন্ধুধারা চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে শ্যামা চটী হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ আসিয়া পৌছিলাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

বিষ্ণুপ্রয়াগ ঃ—এই স্থানে বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। একটি লৌহসেতু পার হইয়া এই প্রয়াগে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে নারায়ণ ও শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গঙ্গার ছুইপার্শ্বে নর ও নারায়ণ নামে ছুইটি পর্ব্বত-শিখর সংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এখানে ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা আছে। রাত্রে এক মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হইল এবং তাঁহার সঙ্গে সদালাপে অতি আনন্দে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে সঙ্গমে স্নান করিয়া কিছু জলযোগের পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। অনুমান বেলা ১২ টায় যাইয়া পোঁছিলাম।

যোশী মঠ

যোশী মঠ ঃ—এখানেই আমরা বিশেষভাবে শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের মধ্যে যোশী মঠ একটি। বর্ত্তমানে এখানে মঠের আদর্শ বিশেষ কিছু নাই। বৎসরের ছয়মাস এ স্থানে বদরীনারায়ণের পূজা হয়। পার্শ্বস্থ মন্দিরে নৃসিংহ, বাসুদেব, ছুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি অবস্থিত। বদরিনারায়ণের পূজারী রাওল

সাহেবের বাসস্থান ইহার নিকটেই অবস্থিত। ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সমস্তই আছে। এখানে পাহাড়ী জড়িবুটি, চাম্ড়া, মৃগচর্ম্ম, মোটা পশমের কম্বল, চামরি গরুর লেজ, হরিণের সিং, মৃগনাভি ইত্যাদি পাওয়া যায়। যাত্রীরা অনেকেই কিছু কিছু কিনিয়া থাকে। মূল্যও খুব অধিক নয়। এখান হইতে একটি রাস্তা নিতিপাশ হইয়া কৈলাস ও মানস সরোবর অভিমুখে গিয়াছে। এখানে তিন দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়া পাণ্ডুকেশ্বর চটীতে পৌঁছিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বর চটী

পাণ্ডুকেশ্বর চটী ঃ—এখানে যোগধ্যানী নারায়ণের অষ্টধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও উদ্ধবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত নারায়ণমূর্ত্তি ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে ও ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণকালে উক্ত মূর্ত্তি এ স্থানে স্থাপন করেন। মন্দিরের ভিতরে তাম্রফলকে পাণ্ডবদের হস্তলিপি আছে। কিন্তু তাহা অদ্যাপি কেহ পড়িতে পারে নাই। মন্দিরের সম্মুখে যে পাঁচটি প্রস্তরের উপর পাণ্ডবেরা বসিয়াছিলেন তাহাতেও কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে। এখানেও কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। এ স্থানে একদিন বাস করিয়া পুনরায় চলিতে থাকি। এখান হইতে অর্দ্ধ মাইল চড়াই পথ অতি দুর্গম, তদুপরি বৃষ্টির ধারায় পর্ব্বত ধ্বসিয়া যাওয়ায় পথ চলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইতেছিল। এই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া হনুমান চটী পৌঁছাই।

হনুমান চটী

হনুমান চটী :—এখানে হনুমানজীর মন্দির ও কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা আছে। পার্শ্ব দিয়া ঝর্ণা প্রবাহিত হইতেছে। এই চটীর দক্ষিণের পর্ব্বতে মহারাজ মরুত্ত দেবগণ সহ মিলিত হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির সাহায্যে উক্ত স্থানে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখনও খনন করিলে সে স্থানে অঙ্গার, তিল, যব প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহার অপর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতোপরি বৈখান মুনির আশ্রম অবস্থিত। পথটির প্রায় স্থানই তুষারাবৃত। এখানে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কয়েকটি কাঠের সেতু অতিক্রম করিয়া রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের তুষারাবৃত শিখরদেশ ও ছোটবড় নানাপ্রকার ঝর্ণা দেখিতে দেখিতে বদরিকাশ্রম উপনীত হইলাম।

বদরিকাশ্রম

বদরিকাশ্রম :—শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শনেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া অন্তর এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এখানে অলকানন্দা ও ঋষিগঙ্গা মিলিত হইয়াছে। জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য বদরীনারায়ণ আবিষ্কার করেন। ইহাকে বৈকুণ্ঠধামও বলা হয়। সম্মুখস্থ পর্ব্বত জয়বিজয় নামে খ্যাত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকাভূমিতে বদরীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। তাহার পাশে কুবেরের ভাণ্ডার এবং সম্মুখে মহাবীর ও গরুড়ের মূর্ত্তি অবস্থিত। দক্ষিণে লক্ষ্মীদেবীর ভোগমণ্ডপ। বামভাগে ঘণ্টাকর্ণের মন্দির। শ্রীমন্দিরের

উপরিভাগ স্বর্ণপাত দ্বারা মণ্ডিত এবং তদুপরি সুবর্ণকলসীর উপর ধ্বজা উড্ডীয়মান। মন্দিরাভ্যন্তরে সুবর্ণবেদীর উপরে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের চতুর্ভূর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তি পরশপাথরে নির্ম্মিত। বিগ্রহের শিরোদেশে হীরকখচিত মুকুট শোভিত এবং তদুপরি সুবর্ণ ছত্র বিদ্যমান। বিগ্রহের দক্ষিণ ও বামে কুবের, উদ্ধব, নারদ ও গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দির মধ্যে যাত্রীদের প্রবেশাধিকার নাই। সম্মুখের বারান্দা হইতে বিগ্রহ দর্শন করিতে হয়। প্রবেশদ্বারের নিম্নদেশে কতকগুলি কুণ্ড আছে, যথা—নারদ কুণ্ড, তপ্ত কুণ্ড, গৌরী কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, নৃসিংহ কুণ্ড এবং ইহার দক্ষিণে অতি শীতল জলবিশিষ্ট কূর্ম্মধারা ও উষ্ণ জলবিশিষ্ট প্রহ্লাদধারা অবস্থিত। গয়াধামের ন্যায় এখানেও কপালমোচন বা ব্রহ্মকপালীতে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে ভোগের অন্নপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ডদানের বিধান আছে। এখানকার পূজারী রাওল সাহেব যখন পূজার জন্য আসেন তখন দুইজন দেহরক্ষী তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ ছত্র ধরিয়া রাখে এবং তিনি রাজবেশে ভূষিত হইয়া মূলমন্দিরে প্রবেশ করেন। প্রবেশ দ্বারের উত্তর পার্শ্বে তাঁহার বাসস্থান। কার্ত্তিক মাসের দেওয়ালি হইতে বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমী পর্য্যন্ত বদরীনারায়ণের উদ্দেশ্যে যোশী মঠে পূজা হয়। তখন এই মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। মন্দিরদ্বার বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডা দোকান ইত্যাদি সমস্ত নিম্নে নামিয়া যায়। পুনরায় বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীতে অতি সমারোহের সহিত মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। ইহার প্রাঙ্গনে নিত্য ভট্টগণ স্তোত্র ও বেদজ্ঞগণ বেদপাঠ করেন।

বদরীনারায়ণের পূজা ও ভোগ—প্রাতে বাল্যভোগ, দ্বিপ্রহরে মহাপূজার পর অন্নব্যঞ্জনাদি ও পরমান্ন ভোগ এবং বৈকালে আরতির সঙ্গে মিষ্টদ্রব্যাদি দ্বারা ভোগ হয়।

কুয়াশার জন্য এখানে সূর্য্যের আলো সহজে দেখা যায় না। প্রায় বাড়ীই ভুর্জ্জপত্র ও স্লেট পাথরের ছাউনিবিশিষ্ট। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস ও কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা আছে। সব জিনিষেরই মূল্য অধিক। এখানকার পাণ্ডারা সুশ্রী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন। যাত্রীদের মধ্যে কাহারও অর্থাভাব হইলে তাহারা ধার দিয়া থাকে। এখানে এগার দিন অবস্থানের পর সুফল আশীর্ব্বাদ লইয়া বসুধারা ও ব্যাসধারা দর্শনমানসে গমন করিলাম।

ব্যাসগুহা

ব্যাসগুহা ঃ--বদরিকাশ্রম হইতে সকাল সাতটায় রওনা হইয়া পাঁচ মাইল অগ্রসর হইবার পর ব্যাসগুহায় পৌঁছিলাম। এখানে লোকের বসবাস বা বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা নাই। এই গুহাটি প্রস্তর দ্বারা এমনভাবে প্রস্তুত যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন পুস্তক দ্বারা গ্রথিত। গুহার দুই পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে ঋক্, সাম, যজু অথর্ব নামে চারিটি ধারা আছে। ইহার সম্মুখে গণেশগুহা, মুচ্‌কুন্দ গুহা ও ব্যাসকুণ্ড তীর্থ অবস্থিত। কিছুটা অগ্রসর হইলে মণিভদ্রপুরী এবং ইহার পরেই সরস্বতী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। সঙ্গমের নাম সরস্বতী প্রয়াগ। যাত্রীরা এখানে স্নান ও দর্শন করিয়া

বদরিকায় ফিরিয়া যায়। এখান হইতে একটি পার্ব্বত্য পথ তিব্বত অভিমুখে গিয়াছে। এখানকার দর্শন শেষ হইলে বসুধারা রওনা হইলাম।

বসুধারা

বসুধারা ঃ—বদরিকা আসিবার সময়ে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্তু বসুধারার পথের ন্যায় এত কষ্টসাধ্য পথ আর পাই নাই। বসুধারায় পৌঁছিয়া কিছুসময় বিশ্রাম করিবার পর স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখানে পর্ব্বত শিখর হইতে যে জলধারা নিম্নদিকে ভীষণ গর্জ্জনে পতিত হইতেছে তাহা দূর হইতে শুনিয়াই যেন ভীতির সঞ্চার হইতে থাকে। এই জলধারা জমিয়া একটি হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। অতি সাবধানে এই হ্রদে নামিয়া স্নান করিলাম। বরফজলে স্নানে শরীর আড়ষ্ট হওয়া দূরের কথা, বরং স্নিগ্ধ ও পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। জনশ্রুতি আছে যে, এই বসুধারা মানুষের পাপপুণ্য পরীক্ষার স্থল। যাহাদের কায়িক পাপ থাকে তাহারা নাকি ইহার নিকটে যাইতেও ভয় পায়। এই স্থানটি হিমালয়ের সীমান্তরেখা। এই স্থান হতে আরও অগ্রসর হইলে তাহার নাম সত্য পথ। এই পথ ধরিয়া পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহার নিকটে সহস্রধারা ও চক্রতীর্থ অবস্থিত। এখান হইতে আমরা বদরিকায় ফিরিয়া আসিলাম। বদরিকাশ্রম হইতে নামিবার সময় কোন কোন দিন আমরা ১৮।২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। এই প্রকারে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। এখান হইতে দিল্লী যাত্রা করিলাম।

হিমালয়ের একটি বিশিষ্ট ঘটনা

একদিন ঝর্ণার নিকট বসিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন আকাশ হইতে প্রকৃতি তাহার একখানি নীল অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়াছে এবং দূর হইতে ঝর্ণার জলের নীল বর্ণ দেখিয়া বৃন্দাবনের যমুনার জলের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে একটি গানের পংক্তিও মনে পড়িয়া গেল—"নীল বসনা যমুনা রাণী গাহিতেছে যেন কি অজানা বাণী"। গানের কথায় বৃন্দাবনের লীলাও অন্তরে যেন দর্পণ দৃশ্যের ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। হঠাৎ ঝর্ণার তলদেশে চাহিয়া দেখি, একদিকে বনের হস্তী স্নান করিয়া শুঁড় দ্বারা অঙ্গে বালি মাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, অপরদিকে ঘাঘ্‌রা পরা ওড়না মাথায় একটি স্ত্রীলোক ব্রজবধূর ন্যায় জলের ঘড়া শিরে লইয়া আড়নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া পার্ব্বত্য পথে গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া হইয়া সঙ্গীকে বলিলাম—বা! এই জনশূন্য স্থানে বধূটি কোথা হইতে আসিল! এ যেন সেই রসিকা ব্রজবধুর চলার ন্যায় ভঙ্গিমা! তাহার ঐ চলার পথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম। পরে একটি পাহাড়ীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল—ইহার সাত মাইলের মধ্যে লোকালয় নাই কিন্তু এখান হইতে তিনটি পর্ব্বতের পরে এক মহাত্মা আছেন। তিনিই হয়ত আপনাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঐ রূপ ধারণ করিয়াছেন। একথা শুনিয়া সেই মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। পরদিন প্রাতে সেই পথ

ধরিয়া মহাত্মার উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলাম। বহু দূরে যাইয়া একটি গুহার সন্ধান পাইলাম। গুহার সম্মুখে যাইয়া বুঝিলাম যে ইহার ভিতর কোন লোক বাস করেন। তখন সঙ্গীটিকে দরজার নিকটে রাখিয়া গুহরে মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম চর্ম্মের আবরণে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে বিস্মিত হইয়া স্পর্শ করিতে গিয়া দেখা গেল, সে কঙ্কাল আর নাই। একটি বালক দাঁড়াইয়া জলপূর্ণ এক মাটির কলসীর উপর আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহাতে আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। এক কলসী ভাঙ্গিবার ভয়, দ্বিতীয়তঃ আদেশ পালন না করা। এরূপ অবস্থায় আদেশ পালন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কলসীর উপর বসিয়া পড়িলাম এবং মনে হইল কলসীর জলের ন্যায় যেন স্থির হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, সেই বালক আর নাই; এক সাম্য শান্ত মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। তিনি বসা অবস্থায়ই আমার মাথা সমান উচ্চ। তাঁহার এরূপে অলৌকিক দর্শন পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিলাম। তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—এ্যাভি জনম্ সার্থক হুয়া। তাঁহার প্রসন্নভাব দেখিয়া এই অলৌকিক যোগসিদ্ধ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহার নিকট এবিষয় বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিলাম।

দিল্লী

এখানে আসিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানকার হিন্দী ভাষা সকল স্থানের হিন্দী হইতে শ্রুতিমধুর।

দিল্লী অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী নগর। যমুনার তীরে শাজাহানের লালকেল্লা। আমরা অনুমতিপত্র লইয়া দুর্গের দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিলাম। পুরাতন দিল্লীর ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে মানমন্দির অতিক্রম করিলাম এবং অদূরে রাজা অশোকের স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর যইল। এই স্তম্ভ প্রশস্ত প্রস্তরখোদিত ও কারুকার্য্যখোদিত। স্তম্ভগাত্রে পরবর্ত্তী কালের মুসলমান কর্ত্তৃক কোরাণের বিবিধ বাণী খোদিত আছে। সোপান অতিক্রম করিয়া স্তম্ভের উপর উঠিতে হয়। অদূরেই হুমায়ুনের কবরস্থান। পূর্ব্বের দিল্লী নগরী আর নাই; সে এখন মহাসমাধিতে পরিণত। পৃথ্বিরাজের লালকুঠী এখন ধূলায় লুণ্ঠিত কিন্তু তাহার ওঁকালিকা দেবী এখনও অন্তর্হিত হন নাই। দেবী যোগমায়া প্রভৃতি দর্শনার্থে বুত্‌থানায় আসা হইল। ইহা একটি মন্দিরের অবশিষ্টাংশ। বুত্‌থানা নামটি মুসলমান প্রদত্ত। ইহার অর্থ পৌত্তলিক ভজনালয়। ইহার মধ্যে ধাতু নির্ম্মিত একটি স্তম্ভ বিরাজমান। দিল্লীর প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় কুতবমিনার। এ স্থানে অসংখ্য মুসলমানদের গোরস্থান। কুতবের বিচিত্র শ্বেতপ্রস্তরের কারুকার্য্য অতুলনীয়। অতঃপর পুরাণ কেল্লা দেখিতে যাওয়া হইল। এই স্থানটি পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। তাহার নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমানে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিয়া প্রায় পনের দিন অবস্থানের পর মথুরা যাত্রা করিলাম।

মথুরা

মথুরা ঃ—মথুরাপুরী যমুনার তীরে অবস্থিত। যমুনার ঘাটের সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত। উভয়পার্শ্বে প্রস্তরস্তম্ভের উপর সুন্দর লতাপল্লবাদি খোদিত। মন্দিরে বিহারিজীর বিগ্রহ। এই বিগ্রহ দর্শন করিতে হইলে রাজদরবারের ন্যায় পূজার নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে ভেট্ নিতে হয়। বিহারিজী বেলা ১০টায় শয়ন হইতে উঠেন। সেই অনুসারে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। এ স্থানে কংস রাজার বাড়ী এখন ধ্বংসপ্রায়। একটি কক্ষে কংস প্রভৃতির মৃণ্ময় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এখানে তিনদিবস অবস্থানের পর শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রেলযোগে গমন করিলাম।

বৃন্দাবনধাম

বৃন্দাবনধাম ঃ—চিরবাঞ্ছিত ব্রজধামে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন সহরের দৃশ্য দেখিবার কথা ভুলিয়া কেবল ব্রজলীলার কথাই মনে উদিত হইতেছিল। এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লওয়া হইল। যমুনার তীরে কোশী ঘাটে অপূর্ব্ব আরতি দর্শনে তৃপ্ত হইয়া 'নিত্য রাস' দর্শন করিলাম। এখানে গোবিন্দজীর মন্দির, বঙ্ক বিহারীর ঝাকি, বংশি বট, কালিয় দমন, বস্ত্রহরণ, নিধুবন, নিকুঞ্জবন, জয়দেব, পদ্মাবতী ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের সমাধি দর্শনীয় বিষয়। এই সকল দর্শনান্তে একদিন যমুনার অপর পারের ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের বনভোজনের তিথি উপলক্ষ্যে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে নৌকার সাহায্যে না যাইয়া সাঁতারে যমুনা পার

হইয়া মুক্তাবনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যমুনার কচ্ছপগুলিও সাঁতার কাটিয়া ওপারে যাইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা আমাদের কোন অনিষ্ট করিল না। এই মুক্তাবনে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের মুক্তাফলগুলি থোকা থোকা লতার গুল্মমধ্যে শোভা পাইতেছে। সেখানে বহুবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি ও মিষ্টান্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে পূজা ও ভোগ হয়। আর মুক্তাবনের ফাঁকে ফাঁকে সকলকে ঐ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইহার ব্যয়ভার বহন করে ধনী মারোয়াড়ী ও হিন্দুস্থানীরা। এই বনভোজনের পর আমরা বৃন্দাবনে ফিরিলাম।

ব্রজবাসী ও দোকানদার কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকে না এবং কাহারও বাড়ী বলিয়া উল্লেখ করে না; পুরুষদিগকে 'রাধাশ্যাম', স্ত্রীলোকদিগকে অষ্টসখীর যে কোন একটি নামে এবং বাড়ীকে 'কুঞ্জ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। এমন কি পুলিশও রাত্রে 'রাধে' হাঁক দিয়া পাহারা দেয়। এখানে লালজী ও শেঠজীর মন্দির এবং দানছত্র বিখ্যাত। নিত্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় টিকিট দ্বারা সাধু ও বৈষ্ণবদিগকে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করান হয়। এই প্রকার অনেকগুলি দানছত্র আছে এবং প্রবাদ— রাধারাণীর রাজ্যে কেহ অভুক্ত থাকে না। নিধুবনে অদ্যাপি প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণলীলা হয়। ইহা কোন কোন ভাগ্যবান্ এখনও দেখিতে পান। এখানে দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য অতি সস্তা ও সুস্বাদু। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা মাতা এখানে দেহত্যাগ করেন। ব্রজের ধুলিতে তাহার সৎকার ও পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করা হইল।
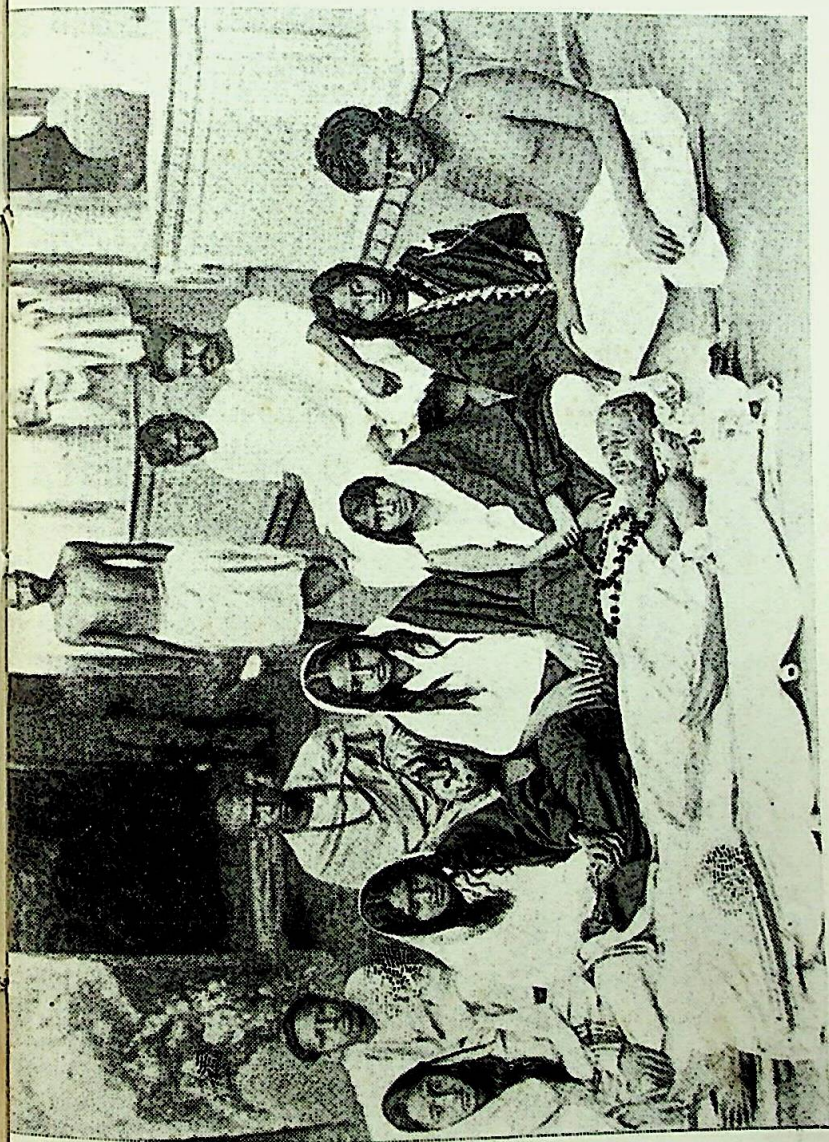
বৃন্দাবনধামে ভবতারিণী দেবীর মরদেহের অবসান।

বৃন্দাবনের একটি বিশেষ ঘটনা

বৃন্দাবনে ধনী ব্যক্তিদের নানাপ্রকার ফলের উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বাগান আছে। উহা রক্ষার জন্য মালি ও দ্বারোয়ান নিযুক্ত থাকে। একদিন সন্ধ্যার সময় এরূপ একটি পেয়ারা বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তখন দেখিলাম, গাছে অনেক পেয়ারা পাকিয়া আছে। দেখিয়া পেয়ারা খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু উহা পাইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া মনে মনে রাখালরাজকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এমন সময় গাছের দিকে চাহিয়া দেখি, পীতবস্ত্রপরিহিত একটি রাখাল বালক পা দোলাইয়া পেয়ারা খাইতেছে এবং আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। লোভ সংবরণ করিতে না পারায় নিকটে যাইয়া আঁচল পাতিয়া সস্নেহে বলিলাম—রাখাল! আমাদের কয়েকটি পেয়ারা দেবে? সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়া বড় বড় পেয়ারা আঁচলে ছুড়িয়া দিতে লাগিল। দ্বারোয়ানরা আমাদের নিকট এত পেয়ারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাহির হইতে এত পেয়ারা কি করিয়া পাইলে? ইতিমধ্যে পেয়ারা ছোঁড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বারোয়ান আমাকেই চোর সাব্যস্ত করিল। গোলমাল শুনিয়া অনেক লোক জমিয়া গেল। আমরা হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাগানের ম্যানেজার বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাদের ছাড়িয়া দিলেন। তখন পেয়ারার বোঝা লইয়া আনন্দ মনে ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম।

বৃন্দাবনের দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন ব্রজবাসীরা আমাদিগকে অষ্টসখীর মন্দিরে প্রসাদ লইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। আমার হাতে কাজ থাকায় সঙ্গীদের পূর্ব্বে সেখানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর যমুনার তীর ধরিয়া মন্দির উদ্দেশ্যে আপন মনে চলিলাম। তখন বেলা প্রায় ১টা; যমুনার তীরে কোন লোকের সাড়া নাই। চলিতে চলিতে কৃষ্ণলীলা মানসপটে উদিত হইল। এমন সময় একটি ৮।৯ বৎসরের পীতবসন পরিহিত বালক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'রাধে' বলিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমিও খেয়ালশূন্য হইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। হুঁস হইলে দেখিলাম, প্রখর রৌদ্রে স্থিরভাবে দুইহাতে নিজের বক্ষ চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু সেই বালক নাই, আছে শুধু তাহার স্পর্শের আনন্দানুভূতি, আর এক অপূর্ব্ব দিব্যগন্ধ ও ভাবশিহরণ। তাঁহাকে আর একবার দেখিতে পাওয়ার আশায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না, কেবল যমুনার বালুকাময় তীর ধূ ধূ করিতেছে। মন্দিরে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়াতে সঙ্গীরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলাম না। কারণ আমার মন তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরপুর। এইপ্রকারে বৃন্দাবনের লীলামাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এখানে ২৪ দিন অবস্থানের পর আগ্রা রওনা হইলাম।

আগ্রা

আগ্রা :—আগ্রা ষ্টেশনে নামিয়া অশ্বযানে যাইয়া বাঙ্গালী ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ইহার সংলগ্ন মন্দিরে ৺কালীমাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সহরটি পুরাতন হইলেও সমৃদ্ধিশালী। মুসলমান আমলের অনেক কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। দুর্গটি একটি দেখিবার বস্তু। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম তাজমহল এখানেই যমুনার তীরে অবস্থিত। ইহার গাত্রে এমন সব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে যাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইহার অপূর্ব্ব শোভা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাজের ভিতরে কোন শব্দ করিলে তাহা তিনবার প্রতিধ্বনিত হয়। ইহার মধ্যে শাহ্‌জাহান ও মমতাজের শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত দুইটি কবর পাশাপাশি অবস্থিত। ফতেপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রাবাদ দেখিয়া আমরা কানপুর রওনা হইলাম।

কানপুর

কানপুর :—এই সহরটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের স্মারক দেউল একটি দেখিবার বিষয়। ইহা দেখিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র লইতে হইত। সমাধির উপর মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত শান্তিদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। তাঁহার মুখাকৃতি এমন স্বাভাবিক ও সুন্দর যে দেখিলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। প্রাচীরগাত্রে নানাপ্রকার ভাস্করকার্য্য খোদিত আছে। এখানে শাল, বনাত, চর্ম্মদ্রব্য ও

পশমের বিবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রাস্তাগুলি পাকা কিন্তু অপরিষ্কার। এখানে তিনদিবস থাকিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে রওনা হইলাম।

লাহোর

লাহোর :—এখানে বাঙ্গালীদের কালীমন্দির সংলগ্ন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে এই নগরটির চতুর্দ্দিক পরিখাবেষ্টিত ছিল। পরে তাহা ইংরেজ কর্ত্তৃক ভরাট হইয়া উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। উদ্যান ফল ফুলে সুশোভিত। এই দেশীয় রমণীরা শাড়ীর পরিবর্ত্তে সালোয়ার ও পাঞ্জাবী ব্যবহার করে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, পাঞ্জাবীদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ কিন্তু দেখা গেল শিখ ধর্ম্মাবলম্বী বেশি নয়। হিন্দুর মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অধিক এবং তাহারা দেখিতে সুশ্রী। এখানে অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীরও বাস আছে। সহরের রাস্তাগুলি পিচের না হইলেও বেশ প্রশস্ত। এখানে সম্রাট্ শাহ্জাহানের এক সুন্দর ত্রিতল উদ্যানভবন আছে। ইহার মধ্যে ফোয়ারার সহস্রধারা পরিশোভিত শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি মণ্ডপ অবস্থিত। এখানে ২০ দিন অবস্থানের পর অমৃতসর যাত্রা করিলাম।

অমৃতসর

অমৃতসর :—এই সহরেও ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। লাহোর অপেক্ষা ইহা ছোট হইলেও লোকসংখ্যা অধিক এবং বহু ধনী

লোকের বাস। ইহা শিখদের প্রধান তীর্থস্থান এবং স্বর্ণমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্বর্ণমন্দিরটি এক বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গুরু রামদাস ইহা খনন করেন এবং গুরু গোবিন্দ ইহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলেন। মুসলমানরা যে সব স্থান গোরক্তে কলুষিত করিয়াছিল গুরু গোবিন্দ সেই সব স্থান যবনরক্তে শুদ্ধ করেন। মন্দিরে যাতায়াতের জন্য একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সেতু আছে। মন্দিরটির গঠন সাধারণ মন্দিরের ন্যায় নহে। ইহার প্রাচীর সোনালি কারুকার্য্যখচিত, শিখরদেশ স্বর্ণমণ্ডিত। মন্দিরাভ্যন্তরে চৌকীর উপর গ্রন্থসাহেব বিরাজমান। দীর্ঘ শ্বেতস্মশ্রুযুক্ত আচার্য্য মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক গ্রন্থসাহেবের সম্মুখে গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। পার্শ্বে গায়কমণ্ডলী মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে ধ্রুপদ গান করিতেছে। সেতুর অপরপারে 'অকালমুঙ্গা' নামক দালান, সম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শ্বেতপ্রস্তরের প্রাঙ্গন। রাত্রিশেষে আচার্য্যগণ এখান হইতে গ্রন্থসাহেবকে মস্তকে করিয়া মঙ্গলবাদ্য সহ বিভুগান করিতে করিতে দরবারে লইয়া যান। সেখানেই মঙ্গলারতি সম্পন্ন হয়। সরোবরের চারিদিকে আদিগ্রন্থ পাঠ করা হয়। পাঠকের মধ্যে স্ত্রীলোকও আছেন। নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় গ্রন্থ শ্রবণ মানসে সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা এখানে সমবেত হয়। স্থানীয় লোক দানী ও অতিথিসৎকারপরায়ণ। এজন্য এখানে সাধুদের যথেষ্ট সম্মান। আর্য্যদের পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন অদ্যাপি ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। এখানে সাত দিন অবস্থান করিয়া আম্বালা রওনা হইলাম।

আম্বালা

আম্বালা ঃ—এখানে আসিয়াও কালীবাড়ী সংলগ্ন ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। এ স্থানে অনেক বাঙ্গালীর বাস এবং তাহাদের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। ছোট সহর হইলেও লোকসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সহরের সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়। তবে দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। এখানে সাত দিন থাকিবার পর কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিলাম।

কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র ঃ—কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনের নিকটেই এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম এবং প্রাতে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে পদব্রজে গমন করিলাম। জনমানবশূন্য অতি নির্জ্জন পথ, দুই ধারে মাঝে মাঝে বাবলা গাছ। যে দিকে তাকান যায় সেদিকেই বহুদূরবিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। ক্রমে আমরা কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপনীত হইলাম। এখানে একটি মন্দিরের পার্শ্বে কয়েকটি ঘর আছে। একটি ঘরে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অন্যান্য যোদ্ধাদের নানাপ্রকার ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি রহিয়াছে।

এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বানগঙ্গা অবস্থিত। ইহা একটি বৃহৎ হ্রদ। নিকটে কোন লোকবসতি নাই, অতি একান্ত স্থান। আশেপাশে বাব্‌লা বৃক্ষ ভিন্ন অন্য বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইলে ভীষ্মদেব বাণাঘাতে জর্জ্জরিত হন। সে সময় তিনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অর্জ্জুন জলের সন্ধান না

পাইয়া বাণের অগ্র ভাগ দ্বারা ভূমি ভেদ করিয়া জল বাহির করিলেন এবং ঐ জল ভীষ্মদেবকে পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। তাই এস্থান অদ্যাপি বাণগঙ্গা নামে খ্যাত। হ্রদের তীরে দুই তিনটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এখানেই পূর্ব্বকালে অর্জ্জুন দ্বিতীয়বার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতা শুনিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জ্জুনকে গীতা শ্রবণ করান। এই গীতার নাম 'উত্তরগীতা'। মন্দির গাত্রে ইহার কয়েকটি শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় খোদিত আছে। কুরুক্ষেত্রের পরিসর চৌরাশী ক্রোশ। এখানের দর্শন শেষ করিয়া প্রয়াগ রওনা হইলাম।

প্রয়াগ

প্রয়াগ ঃ—এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে ছোট লাইন ধরিয়া আমরা প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে পৌঁছিলাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরভূমি। ছয় বৎসর অন্তর এখানে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা হয়। সে সময় বহু সাধু ও যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে মকর সংক্রান্তি হইতে মাঘ মাসের এক মাসকাল সাধু ও গৃহীদের মধ্যে অনেকে 'কল্পবাস' করেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিতে হইলে নৌকাযোগে গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতে হয়। এখানে শিরোমুণ্ডন, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান ও গঙ্গার পূজা অর্চ্চনাদি করাই যাত্রীদের প্রধান কার্য্য। সম্রাট আকবরের লালপ্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গের মধ্যে অসংখ্য দেবদেবী ও মুনিঋষিদের প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

প্রয়াগধাম তীর্থের রাজা বলিয়া ইহার অপর নাম

প্রয়াগরাজ। কুম্ভমেলার সময় যখন লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীদের সমাবেশ হয় তখন এখানকার চড়ার বাঁধের উপর হইতে এ স্থানটিকে স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। সেই সময় অসংখ্য সাধুদের কুটীরে, পাণ্ডাদেরও সরকারী তাঁবুতে নানাবর্ণের পতাকা আকাশপথে উড়িতে থাকায় স্থানটি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। কুম্ভযোগ উপলক্ষে হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, নাসিক ও প্রয়াগে মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই চারি স্থানের মধ্যে প্রয়াগই কুম্ভ মেলার প্রশস্ত স্থান।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই যে, দেবতা ও অসুরদের সমুদ্রমন্থনকালে অমৃত উত্থিত হইলে সেই সুধা লইয়া তাঁহাদের তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। সে যুদ্ধ দ্বাদশ দিন স্থায়ী হয়। দেবতাদের একদিন মর্ত্ত্যের এক বৎসরের সমান। এই সুধাপূর্ণ কুম্ভ পূর্ব্বোক্ত চারিস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। তাই ঐ সকল স্থানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক মতে কুম্ভযোগ স্নানে চতুর্বর্গ ফললাভ হয়।

বেণীমাধব

বেণীমাধব ঃ—ইহা গঙ্গার অপরপারে পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত। মন্দির অভ্যন্তরে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দির সংলগ্ন যে কয়েকটি গুহার ন্যায় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় সত্যই যেন তপোভূমি। এ স্থানটি অতি একান্ত, কেবল মাঝে কৃষকদের কয়েকটি বসতি আছে। এখান হইতে প্রয়াগে ফিরিয়া গয়া যাত্রা করিলাম।

গয়া

গয় ঃ—গয়া পিণ্ডদানের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধদের পরম তীর্থস্থান। এখানে বোধিতরুর মূলে বুদ্ধদেব 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর সনাতন বিশ্বাস, এ স্থানে পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃপুরুষের উদ্ধার বা ঊর্দ্ধগতি হয় না। এজন্য এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার অক্ষয়বট প্রয়াগের অক্ষয়বটের মতই পবিত্র এবং এক রহস্যাবৃত অতীত যুগের পরম সাক্ষী। বৌদ্ধ মন্দিরটি প্রাচীন এবং শিল্পনৈপুণ্যে অপূর্ব্ব। নিকটবর্ত্তী পাহাড়শ্রেণী ও মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের আদরের বস্তু। এখানে কোন কালে প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। সে সময় হইতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ নন্দবংশ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করিয়াছে। অদ্যাপি তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, পুরাকালে এই স্থান শ্বেত কল্পে 'গয়' নামক এক বিশাল দেহধারী পরম বিষ্ণুভক্ত অসুরের তপস্যাভূমি ছিল। তাঁহার কঠোর তপস্যা ও সাধনায় একনিষ্ঠতা দেখিয়া দেবতাদেরও ভয় উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মা যাইয়া অসুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য কি? গয়াসুর বলিলেন—প্রভু, আমি স্বর্গ কিম্বা কাহারও কোন অধিকার কাড়িয়া লইতে চাহিনা, আপনাদের

প্রসাদে আমার এই দেহখানি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক এই প্রার্থনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন—তথাস্তু! অতঃপর যে কেহ গয়াসুরের পবিত্র দেহে দৃষ্টিপাত করিত সেই নিষ্পাপ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিত। যমের অধিকার প্রায় লোপ পাইতেছে দেখিয়া দেবতাগণ পুনরায় বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা গয়াসুরকে যাইয়া বলিলেন—আমাদের একটা অনুরোধ আছে। একটি বিরাট যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা কিন্তু তেমন স্থান খুজিয়া পাইতেছি না। শুনিতে পাই জগতের মধ্যে কেবল তোমার দেহখানিই নিষ্পাপ ও পবিত্র। দেবতাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গয়াসুর কহিলেন—বেশ আপনাদের বাসনা পূর্ণ করিব কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে এ যজ্ঞবেদীর উপর অতঃপর যাহারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিবে তাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা যেন মুক্তি পায়। দেবতারা ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অৰ্দ্ধং ত্যাজতি পণ্ডিতঃ"। তাই তাঁহারা এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। অতঃপর অসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য তাহার মস্তোকপরি প্রকাণ্ড এক পাথর রাখিয়া দেবতারা মহাহর্ষে চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু তবুও অসুর নড়িতে লাগিল। তখন স্বয়ং বিষ্ণু গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়া পাথরখানির উপর পদাঘাত করিলে অসুর স্থির হইল। তাহার দেহ দেশ দেশান্তর জুড়িয়া এক বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় পড়িয়া গেল। নাভিদেশ পড়িল সুদূর উড়িষ্যার যাজপুরে বৈতরণী তীরে। তাই সেই স্থানের নাম নাভিগয়া। আর ফল্গুতীরে তাহার মস্তকটি

শিলাখণ্ডের নিম্নে থাকায় এ স্থানের গয়াধাম নাম হইল। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী বিষ্ণুও সেই সঙ্গে এ স্থানে গদাধর মূর্ত্তিতে বাঁধা রহিলেন।

গয়াকৃত্য ঃ—বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান এবং ফল্গুতীরে শ্রাদ্ধ এ দুইটিই এই তীর্থে মুখ্য কার্য্য। ইহা দ্বারাই পিতৃগণের সদ্‌গতি ও উদ্ধার সাধন হইয়া থাকে কিন্তু সম্যকরূপে গয়াফল লাভ করিতে হইলে আরও অনেক কিছু করিতে হয়। এখানে অন্যূন ৪৫টি তীর্থবেদী আছে। এই সবগুলিতে পিণ্ডদান প্রভৃতি যথেষ্ট খরচ ও সময়সাপেক্ষ।

গয়ার দ্রষ্টব্য বিষয় ঃ—বিষ্ণুপাদমন্দির গয়ার সর্ব্বপ্রধান তীর্থবেদী। যে শিলাখণ্ড দেবতারা গয়াসুরের শিরে রাখিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং যাহার উপর বিষ্ণু পদপীড়ন করিয়া অসুর দমন করেন এখনও সেই শিলাখণ্ডে বিষ্ণুর বৃহৎ চরণচিহ্ন বিদ্যমান। ইহার উপরই যাত্রীদের পিণ্ড অর্পিত হয়। গদাধরের মন্দিরটি কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যে অতি অপূর্ব্ব। অহল্যা বাঈ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের বাহিরে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ মধ্যে নাটমন্দির। ইহার নিকটে গয়েশ্বরীর মন্দির। ফল্গুনদী গয়াসহরের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত; ইহা অন্তঃসলিলা। নদীবক্ষ বালুকাময়; বালি না খুড়িলে জল পাওয়া যায়না। প্রবাদ এই যে, আদি গদাধর দ্রবীভূত হইয়া ফল্গু নদীতে পরিণত হইয়াছেন। এ জন্য ইহা পবিত্র।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ব্রহ্মযোনি পর্বতমূলে অক্ষয়বট অবস্থিত। এখানে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে

কোন জিনিষ দান করিলে পুণ্য লাভ হয়। সহরের উত্তর সীমান্তে রামশিলা পাহাড়ে পাতালেশ্বর ও পার্ব্বতীর মন্দির অবস্থিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাতালেশ্বর মহাদেবের নাসিকা-মূলে হাত রাখিলে নিশ্বাস পতনের ন্যায় মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চরণ অনুভব করা যায়। ইহার নিকটে রামকুণ্ড তীর্থ অবস্থিত।

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া ঃ—এই বুদ্ধগয়াই বৌদ্ধ সাহিত্যের উরুবিল্ব গ্রাম। এখানে কঠোর তপস্যান্তে 'মারকে' পরাভূত করিয়া অবশেষে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এ সহর হইতে ছয় মাইল দূরে ফল্গুর নাম নিরঞ্জনা। এখানে বুদ্ধমন্দির বিখ্যাত। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাশে 'বোধিদ্রুম' নামে বিখ্যাত পিপ্পলবৃক্ষ। সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এই বৃক্ষটিকে অতি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সম্রাট অশোকের অনেক কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন এখানে অদ্যাপি বর্ত্তমান। মন্দিরটির চারিদিক রমণীয় উদ্যানবেষ্টিত। এ স্থানটিতে একটি সাম্য শান্তভাব বিরাজ করিতেছে।

বিন্ধ্যাচল

বিন্ধ্যাচল ঃ—ইহা একটি পীঠস্থান। সহরের মধ্যে গঙ্গাতীরে বিন্দুবাসিনী দেবীর মন্দির অবস্থিত। বিন্ধ্যপর্ব্বত একটি মনোরম উপত্যকা। যুক্তপ্রদেশের গঙ্গা হইতে মধ্যপ্রদেশের নর্ম্মদা পর্য্যন্ত

ইহা সমভাবে বিস্তৃত। কথিত আছে, পুরাকালে বিন্ধ্য অহঙ্কারে সুমেরু অপেক্ষাও মস্তক উন্নত করিলে অগস্ত্যমুনি তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার মানসে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার কালে বিন্ধ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরুকে দেখিয়া বিন্ধ্য সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, অগস্ত্যমুনি বলিলেন—আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি ততদিন তুমি এই ভাবেই থাক। সেই হইতে অগস্ত্যমুনি ফিরিয়া আসিলেন না, বিন্ধ্যও আর মস্তক তুলিতে পারিল না। এই পর্ব্বতের উপর মন্দিরমধ্যে দেবী অষ্টভুজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, দ্বাপরে কংসের ভয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে নন্দালয় হইতে যে কন্যাকে (মহামায়া) কংসের হাতে আনিয়া অর্পণ করেন, কংসরাজ তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে ঐ কন্যা কংসের হাত হইতে শূন্যে উঠিয়া অষ্টভূজা রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেই দেবীমূর্ত্তিই বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে অবস্থিত। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। পর্ব্বতের পাদদেশে শিবনারায়ণজীর ধর্ম্মশালায় আমরা উঠিয়াছিলাম।

বিন্ধ্যাচলের একটি ঘটনা

একদিন রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত হইতে একা ফিরিতেছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ একটি বিরাটকায় পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে? উত্তরে বলিলাম—আমি একজন মাইজী। ইহাতে সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—এত রাত্রে একা একজন মাইজী! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায়ই বা

যাইবে ? একা পথ চলিতে তোমার ভয় করে না ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—মানুষকে ভয় করিবার কি আছে ? এইরূপে কথা বলিতে বলিতে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া রেল লাইনের এক "লেভেল ক্রশিং" এর নিকট আসিলাম। লোকটি তখন ওখানকার "পয়েণ্টস্‌ম্যানকে" হাঁক দিয়া উহার আলোটি তাহার উপর ফেলিতে বলিল এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—মাইজী ! এবার এই আলোতে আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। তখন চাহিয়া দেখিলাম—গৌরবর্ণ এক বিরাট মূর্ত্তি, কপালে দীর্ঘ সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে লম্বা লাঠির অগ্রভাগে টাঙ্গি বাঁধা। বুঝিলাম সে ডাকাত। সে পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—এখনও কি আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় করে না। উত্তরে বলিলাম—ভয় করিবার মত তোমার মধ্যে কিছুই দেখিতেছি না। ইহা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি একজন লেড়কী হইয়া এরূপ সাহস কি করিয়া অর্জ্জন করিলে ? আমি বলিলাম —ঈশ্বরে আস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারাই এই সাহস লাভ করিয়াছি। তখন ডাকাত বলিল—তুমি সাক্ষাৎ অভয়দায়িনী মা। ইহার পর তাহার সঙ্গে ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ২টা। ১০টার মধ্যেই ধর্ম্মশালার দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। দরজা খুলিবার জন্য ম্যানেজারকে ডাকা হইলে তিনি বলিলেন— এত রাত্রে ধর্ম্মশালার দ্বার খুলিবার নিয়ম নাই। ইহাতে ডাকাতটি হাঁক দেওয়া মাত্র দ্বার খুলিয়া দিল। যাওয়ার সময় ডাকাতটি বলিয়া গেল—কাল প্রাতে আসিয়া আপনাকে

এখানকার সকল স্থান দেখাইতে লইয়া যাইব। সে চলিয়া গেলে ম্যানেজার আমাকে বলিলেন—ঐ লোকটি এখানকার ডাকাতের সর্দ্দার। কোন সময় সে আপনাকে ভুলাইয়া মারিয়া ফেলিবে বলা যায় না। উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধর্ম্মশালার মালিকও ঘুষ দিতে বাধ্য হন। উহারা পুলিশকে পর্য্যন্ত ঘুষ দিয়া বশ করিয়া রাখিয়াছে। ডাকাতদের বিষয় সমস্তই শুনিয়া রাখিলাম।

প্রাতে দেখি, সেই ডাকাতটি একটি দাতন হাতে করিয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত। আমাকে দেখা মাত্র নমস্কার করিরা বলিল— মাইজী! চলুন, এখনই আপনাকে বিন্ধ্যাচলের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া আনিব। তাহার সহিত গঙ্গাতীর ধরিয়া কিছুদূর যাওয়ার পর সে একখানি দ্বিতল বাড়ী দেখাইয়া বলিল—এই বাড়ীর নাম 'গোপাল কুটীর'। এখানে কোন ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। এক রাত্রে তাহাদের সকলকে মারিয়া টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছি। এই বাড়ী যদি আপনার পছন্দ হয় তবে থাকিতে পারেন। দেখিলাম, স্থানটি অতি নির্জ্জন, কুলুকুলু রবে পতিতপাবনী গঙ্গা নিকটেই প্রবাহিতা। গঙ্গাতীরে পবিত্র শ্মশান। মাঝে মাঝে কয়েকটি নিম্ব ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। তাহার উপরে স্বচ্ছন্দবিহারী বিহঙ্গের কাকলী এবং অদূরেই নয়ন মনোহর বিন্ধ্যপর্ব্বত। এরূপ একটি পবিত্র বেষ্টনীর মধ্যে মন যেন স্বভাবতঃ শান্তভাব ধারণ করে। স্থানটি পছন্দ হওয়ায় তাহাকে বলিলাম—এখানে আমি সঙ্গীদের নিয়া থাকিব। আমাদের মারিয়া ফেলিবে না ত? উত্তরে সে

বলিল—আমার অধীনে প্রায় হাজার ডাকাত আছে। তাহারা যাহাতে অনিষ্ট না করে সেজন্য আপনাকে উহাদের দেখাইয়া রাখিতে চাই। তাহা হইলে অনিষ্ট ত করিবেই না বরং প্রয়োজনে সাহায্য করিবে। আজ পূর্ণিমা। রাত্রি ১১টায় শ্মশানে আসিবেন। তখন সকলকে দেখাইয়া রাখিব। ইহার পর ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টায় শ্মশানে আসিয়া দেখি, সর্দ্দার আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার কথামত গঙ্গাতীরস্থ একটি অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ডাকাতগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকেই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। সকলে আমাকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া 'বিন্দুবাসিনী মাইকি জয়' ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পর সর্দ্দারটি হঠাৎ একদিন আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল—মাইজী! আমার গুরুজী আপনার দর্শনেচ্ছু। আমার সঙ্গে চলুন। তখন আমরা সকলে সর্দ্দারের সঙ্গে বিন্দু পর্ব্বতের সুরঙ্গপথ দিয়া বহুদূর যাইয়া ভূগর্ভে একটি দ্বিতল বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দ্বিতলে যাইয়া দেখিলাম, উহার গুরুজী অতি বৃদ্ধ ও অন্ধপ্রায়। বয়স প্রায় ১২০ বৎসর। তিনি আমাদের নিকট তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন এবং আলাপান্তে কিছুটা শান্তি পাইলেন। অতঃপর সর্দ্দার আমাদিগকে সুরঙ্গের আরও নিম্নে লইয়া গেলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিলে একটি ৺কালীমূর্ত্তি দেখা গেল। তাঁহার নাম ভদ্রকালী। শুনিলাম,

এই দেবীর নিকট কত যে নরবলি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেবীর পূজা দিয়া বৃদ্ধ গুরুজী আশীর্ব্বাদ করিলে তাহারা ডাকাতি করিতে বাহির হয়। এ সব দর্শনান্তে সর্দ্দার আমাদের গোপাল কুটিরে পৌঁছাইয়া দিল। ইহার পর হইতে প্রায়ই সে দূর হইতে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। লক্ষ্য করিলাম, সে ক্রমশঃ যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কয়েকদিন পর তাহার দলের একটি লোক দেখা করিতে আসিয়া বলিল—মাইজী! সর্দ্দার আজকাল অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর কয়েকদিন মাত্র ডাকাতি করিয়াছিল। এখন ডাকাতি করা ছাড়িয়া দিয়াছে; গুরুজীর সেবাও ঠিকমত করে না।

দিনকতক পর সর্দ্দারটি আসিয়া বলিল—মাইজী! সারা জীবন অনেক পাপ কার্য্য করিয়াছি। দয়া করিয়া আমার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিন। মহারাজ ডাকাতের এইপ্রকার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ডাকাতকে সমাদরে ডাকিয়া বসাইলেন। তখন তাহাকে বলিলাম তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। যদি দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত ডাকাতি করা পরিত্যাগ করিয়া বাকী জীবন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও ঈশ্বর আরাধনা কর তবেই সকল পাপমুক্ত হইয়া শান্তি পাইবে। ভগবান দয়ার সাগর, তাঁর নিকৃষ্ট পাপী তাপী সবই সমান। যে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকে, তিনি তাহাকেই কৃপা করেন। সেদিন হইতেই সে সম্পূর্ণরূপে অন্যায় সংস্রব ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে সাধনায় রত হইল। এখানে কিছুদিন থাকিবার পর ৺কাশীধামে রওনা হইলাম।

কাশী

কাশী ঃ—কাশীধাম আগমন করিয়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেব দর্শন করিলাম। কাশীধামের বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ এখানে সকল প্রদেশের লোক প্রায়ই আসিয়া থাকেন। এই মহাতীর্থ বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। তাই ইহার মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

এখানে ২০ দিন থাকিবার পর পুনঃ রওনা হইবার পূর্ব্বদিন বিশ্বনাথকে পূজা দিতে যাওয়া হইলে পাণ্ডাজীরা বলিলেন—এত কম বয়সে আপনারা চারিধাম দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এজন্য যে ফুল দ্বারা বিশ্বনাথের পূজা হয় তাহারই মালা আপনাদিগকে দিলাম। আমরা সেই ফুলের মালা পাইয়া আনন্দে অলিগলি পথ ধরিয়া আসিতেছিলাম। ঐ মালা দেখিয়া একটি ষাঁড় পথরোধ করিল। বাধ্য হইয়া মমতা নামে সঙ্গীটি বাদে সকলেই মালাগুলি ষাঁড়কে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সঙ্গীটি তাহার মালা লইয়া মনিকর্ণিকার শ্মশানে যাইয়া লুকাইল। তাই তাহার মালা ষাঁড়ে খাইতে পারিল না। রাত প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত শ্মশানে থাকাকালে দেখিলাম, একটি মৃতদেহের সর্ব্বাঙ্গ দাহ হইয়া কেবল পা দুইখানি অবশিষ্ট আছে। ইহা দেখিয়া মমতা বলিল—এই কি দেহের পরিণাম? আমারও কি এরূপ হইতে হইবে? উত্তরে বলিলাম—সকলেরই এ অবস্থা হইবে। অতঃপর আমরা বাসায় ফিরিলাম।

একটি মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাশীতে আসিয়া তোমরা

কি ত্যাগ করিয়াছ? উত্তরে বলা হইল—এ বিশ্বসংসার বিশ্বনাথেরই। তাঁহাকে দিবার মত কি বা আছে! তাঁহাকে দিতে হইলে প্রিয় বস্তুই দিতে হয়। তখনই হঠাৎ মনে হইল মমতার কথা। কারণ তাহার স্বভাবগুণে সে আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্রী ছিল। তাই মনে সন্দেহ জাগিল উহার কিছু না ঘটে। পুনঃ পুনঃ মনে কেবল এই কথাই উদিত হইতে লাগিল।

ঐ দিন একাদশীর উপবাস ছিল। তাই মমতা বলিল—আমার ক্ষুধা পাইয়াছে কিন্তু আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না, কেবল ভাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহার একটু জ্বর ভাব হওয়াতে সে বলিল, পরদিন প্রাতে যেন তাহাকে ভাত দেওয়া হয়। ইহাতে বলিলাম—মানুষের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। তাই কালের বিষয় আজ কি করিয়া বলি? এ কথায় একটু অভিমানবশতঃ সে যাইয়া শুইয়া রহিল। রাত্রি যখন ৪টা তখন মমতা বলিল—বড় পেট ব্যথা, পায়খানায় যাইব। হারিকেনে তেল না থাকায় অন্ধকারে ধরাধরি করিয়া তাহাকে দ্বিতল ইহতে নীচে লইয়া যাওয়া হইল এবং সে পুনঃ পুনঃ বাহ্যবমি করিতে লাগিল। ডাক্তার ডাকা হইলে দেখিয়া বলিলেন—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বৈকালের দিকে রোগীর বিকার দেখা দিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় আছি? উত্তরে বলিলাম বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত কাশীধামে তুমি আছ। ইহার পর সে তিনবার প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ

করিল। প্রাতে শ্মশানবন্ধুদের আনিয়া অন্য সঙ্গীদের সহ মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমার শ্মশানে যাইতে বিলম্ব হইল। যাইয়া দেখিলাম পূর্ব্বদিনের সেই মৃতদেহের ন্যায় তাহারও সর্ব্বাঙ্গ দাহ হইয়া কেবল পা দুখানি বাকী আছে। দুইদিন একই দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। দাহকার্য্য শেষ করিয়া ব্যথিত অন্তরে সকলে ফিরিয়া আসিলাম। কাশীধামে বিশ্বনাথ দর্শনে আমাদের তীর্থপর্য্যটন সমাপ্ত হইল।

—সমাপ্ত—

সত্যব্রত মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের অভিমত ঃ—

এই পুস্তকে (**উদ্বুদ্ধ বাণী**) সাধিকা চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিনীর সাধন কাহিনী ও প্রশ্নোত্তর ছলে তাহার বাণী ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও ব্রহ্মচর্য্য পালন অত্যাবশ্যক সেই বিষয়ে এবং অধ্যাত্ম জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি হৃদয়স্পর্শী। পুরুষ সাধু মহাত্মাদের কাহিনী ও উপদেশ সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য পুস্তকখানিতে নিবদ্ধ একজন বিশিষ্ট সাধিকার বক্তব্যসমূহ মিলাইয়া দেখিলে আধ্যাত্মপথের যাত্রীমাত্রেই যে উপকৃত হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—**"যুগান্তর"** তাং ৬ই বৈশাখ, ১৩৬০।

পুস্তকখানিতে (**উদ্বুদ্ধ বাণী**) শ্রীশ্রীচিন্ময়ী মাতার বাণী কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে।

—**"জন সেবক"** তাং ১৩।৯।৫৩

সতব্রত মঠের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীচিণ্ময়ী ব্রহ্মচারিণী শৈশব হইতে ধর্ম্মভাব-সম্পন্না ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নির্জন অরণ্যে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হন। কয়েক বৎসর হিমালয়ে তপশ্চারণের পর সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ায় সত্যব্রত মঠ স্থাপন করেন। বর্তমানে ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় উক্ত মঠের একটি শাখা স্থাপন করিয়া অধিকাংশ সময় তথায় অবস্থান করেন। আলোচ্য গ্রন্থে (**উদ্বুদ্ধ বাণী**) ব্রহ্মচারিণী চিণ্ময়ী দেবীর উপদেশসমূহ সংকলিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলি পাঠ করিলেই উপকৃত হইবেন। ভাষা প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের উপলব্ধির পক্ষে উপযুক্ত।

—**"দেশ"** তাং ২৮।৩।৫৩